আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন

বর্ষাকালীন সংখ্যা

শ্রাবণ ১৪২৯

দেখতে দেখতে বর্ষা ঘনঘোর হয়ে উঠল। কবির চোখে বর্ষা একরকম, নিছক গদ্যকারের চোখে সেই চেহারাই আবার আরেক রকম। হরিপদ কেরানীর চোখে এক রকম আবার আকবর বাদশার চোখে তার চেহারা আরেক রকম। আমাদের এবারের আয়োজনে রইল নানা চোখে দেখা এই বর্ষারই জলরঙে ভেজা, হালকা আর আবছা হয়ে আসা অন্য রকম দিনগুলিরই সোঁদা গন্ধ, যা দিনের পর কেটে যাওয়া , হারিয়ে যাওয়া, মুছে যাওয়া মুহূর্তগুলিকে আপনার কাছে ফিরিয়ে আনবে লহমায় ...

সম্পাদকীয়

আশিস পণ্ডিত

ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক (অপব্যবহার নিরোধক) আইন ২০০৫ সামনে নিয়ে সম্প্রতি নির্মীয়মাণ নতুন সংসদ ভবনের মাথায় বসানো জাতীয় স্তম্ভের পরিবর্তিত রূপ নিয়ে বিতর্ক যখন তুঙ্গে এরকম সময়ে আমাদের নতুন সংখ্যা নিয়ে আমরা পাঠকের দরবারে হাজির।

যত দিন যাচ্ছে লক্ষ্য করা যাচ্ছে নানা প্রসঙ্গে এরকম বিতর্ক উস্কে দিয়ে জাতীয় জীবনে এক ধরনের বিচিত্র মোড় আনার প্রবণতা বিভিন্ন মহলেই বেড়ে চলেছে। একথা ঠিক যে, বিতর্ক নিঃসন্দেহে প্রাণের ইঙ্গিত, নিস্তরঙ্গ জনজীবনে এক ধরনের চলতি ধারাকে অনুসরণের প্রবণতাই থাকে বেশি। সেই দিক থেকে বির্তককে আহ্বান করে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে নিঃসন্দেহে অস্বীকার করা যায় না ; কিন্তু সেক্ষেত্রেও প্রশ্ন থাকবে বিতর্কের চারিত্র্য নিয়ে। অর্থাৎ সে বিতর্কের মূলে কি আদৌ কোনো জরুরিতা কাজ করছে , না সে বিতর্ক উস্কে দিতে চাইছে নিছকই কোনো বিতর্কের জন্য বিতর্ককে ! আর সাম্প্রতিক বিতর্ক যেহেতু জাতীয় প্রতীক ঘিরে , ফলে এ প্রসঙ্গে এ প্রশ্ন উঠবেই। বিশেষ করে এমনিতেই যখন দেশের সার্বিক অবস্থা যখন মোটেই সুবিধাজনক নয়, তখন এধরনের বিতর্কিত পদক্ষেপ আদৌ কাম্য কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতেও বাধ্য। আশা করা যাক এধরনের অবাঞ্ছিত বিতর্কের কবল থেকে দেশ অচিরেই মুক্ত হবে।

এই সংখ্যা যখন প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে তখন বাংলা চলচ্চিত্রে একটি যুগের অবসান ঘটিয়ে বিদায় নিলেন প্রবাদপ্রতিম চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার। তাঁর কাজের

যথাযথ মূল্যায়ণ হতে সময় লাগবে অনেক। এই সংখ্যায় রইল কেবল এই মহীরুহপ্রতিম ব্যক্তিত্বের প্রয়াণে পরের প্রজন্মের শ্রদ্ধা। এই বছর সাংবাদিক , ভাবুক গৌরকিশোর ঘোষের জন্মশতবর্ষ। আমাদের ফিরে দেখায় তাঁর প্রতি রইল সশ্রদ্ধ বীক্ষণের প্রয়াস। রদ্ধা।

অন্যান্য সংখ্যার মতো এই সংখ্যাটিও আপনাদের প্রশ্রয় পাবে আশা করতে ইচ্ছে হয়।

সূচিপত্র

ভালোবাসার ঘরবাড়ি আর আলোয় হেসে উঠবে না Page 6
অমিতাভ গুপ্ত

‘তলাবিহীন ঝুড়ি’ হাসিনার সৌজন্য এখন ‘এশিয়ার বাঘ’ Page 9
তরুণ চক্রবর্তী

বিশ্বখাদ্যসংকট ও ভারত Page 14
বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

গৌরকিশোর ঘোষ : মেরুদণ্ডের পরিচয়ে চিহ্নিত একজন মানুষ Page 18
তপন দে

শতবর্ষে গৌরকিশোর: ' এই দাহ' র অন্তরালে Page 20
গৌতম রায়

বৃষ্টি ভেজা সকাল Page 23
আদিত্য সেন

প্রসঙ্গ ভারতীয় হকি এবং কিছু কথা Page 28
প্রসেনজিৎ মজুমদার

বৃষ্টি Page 32
চৈতালী চট্টোপাধ্যায়ায়

কোভিডের পরে বাংলা কাগজ Page 33
অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জল পড়ে পাতা নড়ে Page 36
বিশ্ব মণ্ডল

বৃষ্টির ফোঁটাগুলো Page 37
রাজা মজুমদার

ভেন্টিলেশনে কলকাতার সিনেমা হল ... চাই অক্সিজেন Page 38
কিঞ্জল রায়চৌধুরী

স্মৃতির সেদিন : বাংলা সিনেমা Page 45
চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

১০০ বছরের ঐতিহ্যে আজও অম্লান 'মিত্র কাফে' Page 48
কিঞ্জল রায়চৌধুরী

নীতিগত ব্যর্থতাই বেকার সমস্যাকে তীব্র করে তুলছে Page 52
সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

লেখা ১

ভালোবাসার ঘরবাড়ি আর আলোয় হেসে উঠবে না

অমিতাভ গুপ্ত

আমরা যখন বড় হচ্ছি, মানে কলকাতা যখন এত ঝাঁ চকচকে হয়নি, হলদে বাল্ব-এর মনমরা আলো মেখে বিকেল যখন সন্ধ্যেয় ঢুকত, পাড়ার ছেলেগুলো খেলার শেষে রকে বসে গুলতানি করত, তখন সেই আড্ডাগুলোতে একটা না একটা ক্যাবলা কেদার থাকত --- যে কিছুই পারত না, ঐ আব্বুলিশ টাইপের ; তাকে সহজেই মাথায় চাঁটি মারা যেত, সে পরীক্ষায় গাড্ডু পেত, আড়ালে অনেকেই তাকে 'ফেলদা' বলে ডাকত.... কিন্তু সে সবার সঙ্গেই মিশে থাকত। ভোম্বলদাদের সঙ্গে একসঙ্গেই থাকত। বিজয়া শেষের জলসায় পাড়ার নাটকের একটা সাইড রোল, স্টেজ সাজানো এইসব দিয়ে দিব্য তাকে ম্যানেজ করে ফেলা যেত... চোখদুটো ফ্যালফেলে থাকার সুবাদে খুশি হল না কি দুঃখ পেল কেউ বুঝত না, বুঝতে চাইতও না বোধহয়।

কিন্তু সেই ছেলেটাই হঠাৎ একদিন একটা দুর্দান্ত কিছু করে চমকে দিত সবাইকে... পাড়ার রাশভারী সরস্বতীর চোখে আচমকাই একটা আলো খেলা করে যেত, আমাদের চোখে ঠিক ধরা পড়ে যেত। শত হলেও ,কেদারের মতো যেমন , ভোম্বলদার মতোও কেউ না কেউ তো পাড়ায় থাকতই ; তার চোখ এড়াবে সাধ্য কার ?

বড্ড ভালোবাসায় মোড়া থাকত সেই সময় আমদের আটপৌরে বাড়িগুলো, হরিদাসের বুলবুলভাজার মতো না হলেও ঘটি গরম হেঁকে যেত লোডশেডিংয়ের সন্ধ্যেবেলায়।

আমদের ছোটোবেলা, কিশোরবেলাটা টইটম্বুর ছিল এইসব সহজ যাপনে। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস মানে ল্যাব হতেই হবে, এটা অনেকেই জানতাম না – বোটানির প্র্যাকটিক্যাল মাঠে হতে বাধা কি? তারপর সময়টা হুড়মুড়িয়ে পাল্টে গেল খুব দ্রুত... আমরা ভালো করে বোঝার আগেই দেখলাম আমাদের ছেলেমেয়েরা ইউটিউব দেখে জগৎ চিনছে... সবাই ফেলুদার মতো চৌখস হতে চাইছে, 'ফেলদা' রা জাস্ট মুছে যাচ্ছে অচল আধুলির মতো।

ওদের ছেলেবেলায় আজকাল আর কোন গল্প তৈরি হয় না... ওরা তৈরি চিত্রনাট্য মেনে অভিনয় করে যায় খুব ছোট্টবেলা থেকেই .... বাতিল চিত্রনাট্যের কোনো জায়গা নেই ওদের জীবনে। রিটেকের কোনো লাক্সারি নেই, এক শটেই সিন ওকে করতে হবে।

ওদের জীবনে গল্প বলার লোকগুলো চলে যাচ্ছে খুব দ্রুত।

শুধু কি ওদের জীবনে ? আমরা যারা দেখেছি যৌথ পরিবার ভেঙে টুকরো হতে, বন্ধ কারখানার মাটিতে সদম্ভে শপিং মলকে মাথা তুলতে দেখেছি, সিনেমা হলের হাফটাইমের ভুট্টার খইকে পপকর্ণে পাল্টে যেতে দেখেছি --- তারা তো বেশ মনে করতে পারি যে বাড়ি শুদ্ধু কাকিমা - জেঠিমারা হইহই করে ম্যাটিনি শোয়ে 'বই' দেখতে যাচ্ছেন, এবং যখন ফিরছেন তখন একটা অদ্ভুত ভালো লাগার আলো খেলা করছে তাঁদের চোখে-মুখে। বাঙালি পরিবারে তখনও উল্টোরথ আসত, নবকল্লোলের সিনেমার পাতায় চোখ রেখেই দুপুরযাপন হত বাঙালি গিন্নিদের। মুরগির ব্যবসাকে বাঙালি মজার ছলেই আর পাঁচটা ব্যবসার মতো আরেকটা ব্যবসা হিসেবেই দেখত। আমদের জীবনে দাদার কীর্তি দেখানোর জন্য আপনি ছিলেন, ভালোবাসা চেনানোর জন্য আপনি ছিলেন - আমাদের ছেলেমেয়েগুলো আজ বড্ড কাঙাল হয়ে গেল ... ভালো সিনেমা শুধু যে আপনিই বানিয়েছেন, একথা শুনলে

এস এস কে এমের এনাটমি বিভাগের ঘরটা থেকে সবার আগে আপনি প্রতিবাদ করে উঠবেন, সেটা আমি জানি... কিন্তু কী জানেন তো, ঐ যে সত্যজিৎ রায় একবার আপনাকে বলেছিলেন 'পর্দায় কখনো মিথ্যে বলবেনা' , সেটা যে আপনি মেনে চলেছেন আপনার পুরো জীবনটা জুড়ে, এবং আপনার দর্শকরা আপনার বলা গল্পগুলোর সঙ্গে নিজেদের রিলেট করতে পেরেছিল, তার কারণ আপনি নিজের জীবনেও নিজের বিশ্বাসের প্রতি আনখশির সৎ ছিলেন। একজন সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে আপনি কোনোদিন নিজের রুমাল দিয়ে শাসকের চেয়ার মোছেননি, কারণ ওটা আপনার কাজ বলে আপনি কোনোদিন মনেই করেননি। আপনি বিশ্বাস করতেন, আপনার কাজের জায়গা স্টুডিও, মানুষের মুখরিত সখ্য, মানুষের মধ্যে থেকে আপনি ছেঁচে নিয়েছেন চিত্রনাট্যের কাঠামো, আংটি চাটুজ্যের ভাই শুধু বইয়ের পাতা থেকে নয়, বরং বইয়ের পাতার সঙ্গে জীবনের অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে দিয়ে তাকে পর্দায় জীবন দিয়েছেন।

আজকের দুনিয়াটা দেনাপাওনার দাঁড়িপাল্লায় রেখে সবকিছুকে ওজন করতে অভ্যস্ত। এই সর্বগ্রাসী দুনিয়াটা সদ্য- কিশোরদের জন্য বড্ড কঠিন হয়ে উঠছে প্রতিদিন, একটা চাহিদার ওপর দাঁড়িয়ে আরেকটা চাহিদা... এই চাহিদার চাপে দাঁড়িয়ে শিরদাঁড়াটাকে নুইয়ে দিতে হচ্ছে অনেক জায়গায়। আপনারা আপনাদের জীবন দিয়ে শিখিয়ে গেলেন ছোটোখাটো চেহারার মধ্যেই একটা মজবুত, ঋজু শিরদাঁড়া বাঁচিয়ে রাখা যায় এবং আপোস না করেও বাঁচা যায়। ফুল, রাষ্ট্রীয় তোপ সবকিছুকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একটা লাল পতাকা আর একটা গীতাঞ্জলি নিয়ে চলে গেলেন - লাল পতাকা মানে মানুষের গন্ধ, রবীন্দ্রনাথ মানে বাঙালির হৃদস্পন্দন ; আফশোষ একটাই --- আমাদের বড়ো হওয়ার সময় আপনি ছিলেন কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েগুলো বড়ো হওয়ার সময় আরেকজন তরুণ মজুমদার কি আসবেন ? কে জানে ! বড্ড ফাঁকা হয়ে গেল চারপাশটা, আলোগুলো ফেড আউট করে গেল ... সেটটা পড়ে রইল, কিন্তু শ্যুটিংটা প্যাক আপ হয়ে গেল।

লেখা ২

‘তলাবিহীন ঝুড়ি’ হাসিনার সৌজন্য এখন ‘এশিয়ার বাঘ

তরুণ চক্রবর্তী

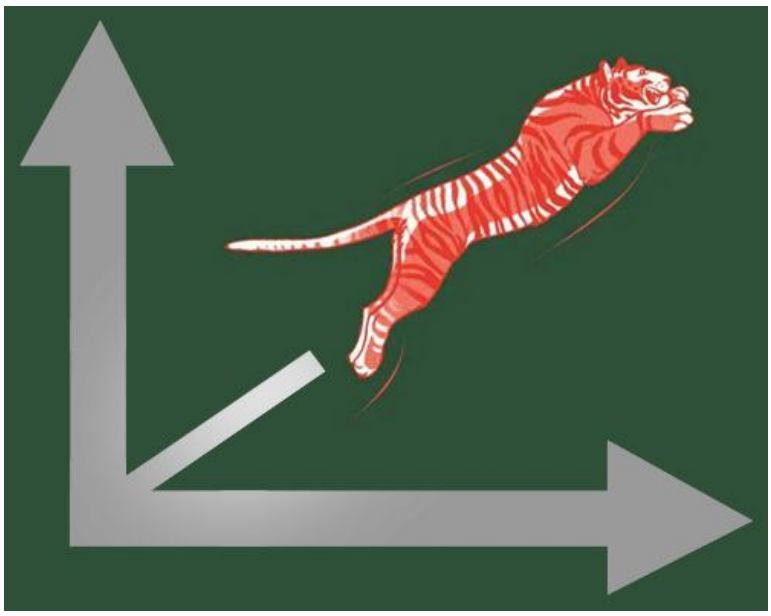

বাঘের গর্জন শুনেছেন? উন্নয়নের সমস্ত সূচকেই এখন সেই গর্জন শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশের সকর্বত্র। পদ্মা সেতু তারই একটি জ্বলন্ত উদাহরণ মাত্র। বাংলাদেশের জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ শেখ মুজিবুর রহমান যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁকে কঠোর হাতে দেশনেত্রীর মমত্ব দিয়ে সফল করে তোলার যুদ্ধ চালাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তারই সুযোগ্য নেতৃত্বে এতো ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। কিসিঞ্জারের সেই তলাবিহীন ঝুড়িই এখন এশিয়ার বাঘ হিসাবে স্বীকৃত। জন্মের মাত্র ৫২ বছরে গোটা দুনিয়ার সমীহ আদায় করে নিয়েছে বাংলাদেশের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করে জন্ম নেওয়া স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতনৰ্ত্রী বাংলাদেশ মাত্র ৫০ বছরেই গোটা দুনিয়াকে আর্থিক বিকাশের সহজ পাঠ দিতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই দারিদ্রতাকে প্রায় বোতল বন্দি করে উন্নয়নশীল দেশের তকমা আদায় করে নিয়েছে লাল-সবুজের দেশ। এর বিপরীতে পাকিস্তান প্রায়টচ দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। চরম অর্থ সঙ্কটে সরকারি কর্মীদের বেতন দিতেই তারা হিমশিম খাচ্ছে। অর্থনীতিবিদরা বলতে বাধ্য হচ্ছেন, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বাংলাদেশ আজ এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আর্থিক বুনিয়াদের ওপর দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। পশ্চিমি দুনিয়াও বাংলাদেশের উন্নয়ন ও সাফল্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁরা

বলছেন, গোটা দুনিয়াকে নতুন অর্থনৈতিক দিশা দেখাচ্ছে হাসিনার বাংলাদেশ। স্রোতের বিপরীতে গিয়ে রপ্তানিমূলক উতপাদনের হার বাড়িয়েই বাংলাদেশ সাফল্যের নতুন দিশা দেখিয়েছে। ইওরোপ-আমেরিকা বা পূর্ব এশিয়ায় বাইরেও যে রপ্তানি বানিজ্যের হাত ধরে উন্নয়ন সম্ভব, সেটাও প্রমাণ করে চলেছে বাংলাদেশ। সেইসঙ্গে বাড়িয়েছে মানুষের ক্রয় ক্ষমতাও। জাপান, তাইওয়ান বা চীন উন্নতি করলেও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলিকে নিয়ে চিরকালই হতাশাই ব্যক্ত করে এসেছেন অর্থনীতিবিদরা। বাংলাদেশ নিয়ে তো জন্মলগ্ন থেকেই নেতিবাচক মনোভাব দেখিয়ে এসেছেন পশ্চিমি বিশেষজ্ঞরা। আমেরিকার বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ জো স্টিগ্লিটজ এবং ড্যানি রড্রিকের ভবিষ্যতবাণী ছিল, পূর্ব এশিয়া বা ইওরোপের বাইরে রপ্তানিকেন্দ্রীক উতপাদনের মাধ্যমে উন্নয়ন সম্ভবই নয়। উন্নয়নশীল দেশগুলিকে তাঁরা চিরকাল রপ্তানীকেন্দ্রীক উতপাদনশীল অর্থনীতির বদলে অন্য কোনও পথ খোঁজার পরামর্শ দিয়ে এসেছেন। তাঁদের আশঙ্কার ছিল, অচিরেই বাংলাদেশের মতো দক্ষিণ এশিয় দেশগুলির কলকারখানা সব বন্ধ হয়ে যাবে। শ্রমিকরা কাজ হারাবেন। দুনিয়া জুড়ে চলবে শুধু যন্ত্র নির্ভর শিল্প। তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবেনা দক্ষিণ এশিয় দেশগুলি। মোদ্দা কথায়, ইওরোপ বা পূর্ব এশিয়ার বাইরে কল-কারখানার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বহু অর্থনীতিবিদ ভাবতেই পারেননি। মালেশিয়া, তুরস্ক বা ইসরায়েলকে তারা ব্যতিক্রম বলে মনে করেছেন।

দুনিয়ার অর্থনীতিবিদদের ভুল ভাঙাতে যথেষ্ট বাংলাদেশের শিল্পায়ন। পূর্ব এশিয়া বা ইওরোপের বাইরেও সফল শিল্পায়ন সম্ভব, সেটা দেশটি সাফল্যের সঙ্গে করে দেখাচ্ছে। মাথাপিছু গড় আয়ে পাকিস্তানকে অনেকটাই পিছিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। অনেক ক্ষেত্রে ভারতকেও টেক্কা দিচ্ছে তারা। ভারতীয়দের ক্রয় ক্ষমতা এখনও বেশি হলেও দ্রুত এগিয়ে আসছে বাংলাদেশ। অন্যদিকে, উন্নয়নের নিরীখে আরও পিছিয়ে পড়ছে পাকিস্তান। দুর্নীতি আর জঙ্গিবাদীদের তোষণ করতে গিয়ে পাকিস্তান প্রায় দেউলিয়া হতে বসেছে। কর্মচারীদের বেতন দিতেও তাদের অন্য দেশের কাছে হাত পাততে হচ্ছে। ফরেন রিজার্ভ তলানিতে ঠেকেছে। চীন পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোরের পাশাপাশি বিভিন্ন খাতে বেজিং থেকে ঋণ নিয়ে নিজেদের সার্বভৌমত্বকেও চীনের কাছে বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়েছে ইমরান খানের সরকার। এমনটা বলছেন সে দেশেরই অর্থনীতিবিদদের একটা বড় অংশ। তাঁদের মতে, পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী মুখে যাই বলুন না কেন, দেশকে ভুল পথে চালিত করে অর্থনীতির সর্বনাশা পথে পূর্বসুরীদেরই তিনি সহযাত্রী। শ্রীলঙ্কার ভরাডুবিতেও শিক্ষা নেয়নি পাকিস্তান। চীনের কাছে দেশের আর্থিক

শুধু নয়, সামরিক স্বাধীনতাও বন্দক রেখেছে ইসলামাবাদ। অন্যদিকে, সঠিক পথ বেছে নেওয়ায় ঢাকার আর্থিক উন্নতি আজ গোটা দুনিয়াতেই প্রশংসিত।

সামনেই সাধারণ নির্বাচন। তাই এই সাফল্য ধরে রাখতে বাড়তি সতর্কতা জরুরি। কারণ পাকিস্তানপন্থী স্বার্থান্বেষিমহল এই উন্নয়নের বহর সহ্য করতে পারছেনা। অতীতের মতোই ফের তারা সক্রিয় হওয়ার মতলব কষছে। সেটা নিয়েই চিন্তিত আন্তর্জাতিকমহল। তাদের মতে, এই উন্নয়নের ধারাকে অব্যহত রাখতে হবে। তারজন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা। কোনও অবস্থাতেই দেশকে অস্তিরতার দিকে ঠেলে দেয়া চলবেনা। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে আগলে ধরেই স্বাধীনতার চেতনা বিরোধীধের যাবতীয় ষরযন্ত্র ভেস্তে দিতে হবে।।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০১৯-এ বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৫ থেকে ৭ শতাংশে উত্তরণ প্রশংসিত হয়েছে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার কাছে। পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনা টেনে তাঁরা বলেন, দারিদ্রতা বৃদ্ধির হারেই শুধু টেক্কা দিচ্ছে পাকিস্তান। আর অর্থনীতির সবসূচকেই এগিয়ে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের এই আকাশচুম্বী উন্নয়নের কারণ অনুসন্ধানেরও আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, ২০০ বছর আগে ব্রিটেন যেভাবে তৈরি ও বিক্রির নীতিকে আগলে ধরে শিল্পায়নে মনোযোগী হয়ে সফল হয়েছিল, ঠিক সেই নীতিরই সফল রূপায়ণ করে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এদেশের গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজের সুনাম এখন গোটা দুনিয়া জুড়ে। নামী-দামি কোম্পানির পোশাকে লেগে রয়েছে বাংলাদেশের নাম। পোশাক রপ্তানিতে চীন বা ইওরোপিয় ইউনিয়ন এখনও এগিয়ে। কিন্তু ভিয়েতনামকে হঠিয়ে বাংলাদেশ উঠে এসেছে তিন নম্বরে। দেশের রপ্তানি বানিজ্যে পোশাক এক নম্বর পণ্য।

তবে রাতারাতি বাংলাদেশের আর্থিক উন্নয়ন কোনও জাদুদন্ডের সাহায্যে হয়নি। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক তাদের ২০৮ পাতার প্রতিবেদনে বাংলাদেশের শিল্পনীতির ব্যাখ্যা করেছে। সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী, সত্তরের দশকের শুরুতেই বাংলাদেশের তখনকার নীতি-নির্ধারকরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পাঁচ বছরীয় সুপরিকল্পনার মাধ্যমে নতুন শিল্পভাবনাকে বিকশিত হতে সাহায্য করেছে। গার্মেন্ট শিল্পকে উতসাহিত করার পাশাপাশি সুগম করা হয়েছে বিদেশি বিনিয়োগের পথকেও। সেইসঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের স্পেশাল ইকনোমিক জোন তৈরিও প্রশংসিত হয়েছে। সেইসঙ্গে রপ্তানির ক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ আন্তরিকতাকেও আন্তর্জাতিক দুনিয়া ভালোভাবে নিয়েছে। কর ও শুল্ক ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সরকার রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় দিয়ে উতসাহিত করেছে

বিনিয়োগকারীদের। ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবের মতোই উতপাদনশীল কল-কারখানা স্থাপনে পরিকল্পনামাফিকই এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। পাকিস্তান গরীব থেকে গরীবতর হলেও বাংলাদেশ কিন্তু উতপাদনমুখী অর্থনীতির হাত ধরে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। মানবসম্পদনির্ভর শিল্পায়নের ঝুঁকিগত দিক দেখিয়ে অনেকেই বাংলাদেশকে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপক যন্ত্র নির্ভর শিল্পায়নের সময়ও মানবশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সফল শিল্পায়নের উদাহরণ হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। তবে মৌলবাদীরা বাংলাদেশের এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে উঠতে পারে। তাই এবিষয়ে সরকারকে সতর্ক থাকার অনুরোধ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

অর্থনীবিদদের আসলে বাংলাদেশের বর্তমান সাফল্যকে অবজ্ঞা করার কোনও উপায়ই নেই। তবে ধনী দেশের তকমা পেতে বাংলাদেশকে আরও অনেকটা দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রেও রপ্তানি নির্ভর উতপাদনশীল অর্থনীতি এবং পূর্ব এশিয়া ও ইওরোপে নিজেদের বাজার বৃদ্ধি তাঁদের সেই উন্নয়নের পথকে সুগম করবে। পাকিস্তান-সহ বহু দেশকে পিছনে ফেলে বাংলাদেশ এশিয়া বাঘের গর্জনে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হবেই।

পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনও তুলনারই আজড আর জায়গা নেই। পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাদেশের জিডিপির হার যেখানে ৭.৯ শতাংশ, সেখানে পাকিস্তানে জিডিপি থমকে আছে ১.৫ শতাংশে। পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রা ভান্ডার এখন তলানিতে এসে ঠেকেছে। মাত্র ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রয়েছে তাদের ফরেন রিজার্ভ। বিপরীতে বাংলাদেশের এখন বিদেশী মুদ্রা ভান্ডারে রয়েছে ৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের। করোনার কারণে শ্রীলঙ্কার পর্যটন শিল্প মার খাওয়ায় তাদের ২৫০ মিলিয়ন ডলার ঋন দিয়েছে বাংলাদেশ। অন্যদিকে, সৌদি আরবের তেলের দাম মেটাতে ফের চীনের কাছ থেকে ১ বিলিয়ন ডলার ধার নিয়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের বেহাল অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফিতির হার ১১.১ শতাংশ। গত বছর বাংলাদেশে এই হার ছিল মাত্র ৫.৫ শতাংশ। শিল্পক্ষেত্রে পাকিস্তানের ১৯.৭৪ জিডিপির বিপরীতে বাংলাদেশের জিডিপি ৩৫.৬৬ শতাংশ। মাত্র ২০.৫ শতাংশ মানুষ বাংলাদেশে দারিদ্রসীমার নীচে বাস করলেও পাকিস্তানে এই বার ৩৫.১ শতাংশ। বেকারত্ব, শিক্ষা, গড় আয়ু, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন সমস্ত সূচকেই পাকিস্তান অনেকটাই পিছিয়ে।

এই ব্যাপক উন্নয়নের পরেও স্বাধীনতার শত্রু, নব্য রাজাকারের দল কিন্তু চুপচাপ বসে নেই। বিদেশী শক্তির মদদে তারা চিরকাল নিজের দেশেরই সর্বনাশ চেয়ে এসেছে। তাই ৩০ লক্ষ শহিদের রক্ত আর ৩ লক্ষ বীরাঙ্গনার ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার পর থেকেই ষরযন্ত্র চলছে। জাতির পিতাকে হত্যা করেও তারা তৃপ্ত নয়, শেখ হাসিনাকেও বারবার হত্যার চেষ্টা করে দেশটিকে তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত করতে চেয়েছে। কিন্তু শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে ঘাতকদের বারা ভাতে ছাই দিয়ে টাইগাররা এগিয়ে চলেছে।

সামনেই সাধারণ নির্বাচন। গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উতসব। সেই উতসবকেও কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা এবং ষরযন্ত্র চলছে। সেই ষরযন্ত্রে বিদেশি শক্তিকে মদদ জোগাচ্ছে বাংলাদেশরও একটি অংশ। তারা যত ছোটই হোক না কেন, তাদের বিষ দাঁত বেশ শক্ত। জাতিরপিতার রক্ত লেগে আছে তাদের পোশাকে। তাই সতর্ক থাকতে হবে, বাংলাদেশের উন্নয়ন ও সার্বভৌমত্বের স্বার্থেই এটা জরুরি।

বিশ্বখাদ্যসংকট ও ভারত

বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

খাদ্যের দাম বেড়েই চলেছে। প্রশ্ন ওঠে, এটা কি শুধু ভারতেই, না সর্বত্র ?

যদি অন্যান্য দেশেও হয় তাহলেও আমাদের দেশে অন্তত এর সমাধান কেন হচ্ছে না ? দাম যে কখনো কমে না, এটা সবারই জানা। পরশুরাম ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন ঋষিপত্নীর জবানীতে, 'সত্যযুগে এক কার্ষাপণে দুই ঘড়া খাঁটি গব্যঘৃত মিলিত, এ দগ্ধ ত্রেতাযুগে মাত্র এক ঘড়া পাওয়া যায়, তাও ভইঁসা।' সে যাক্। খাদ্যসংকটের চেহারা ঠিক কি? আর দামও বেড়েছে কতখানি ? পরিসংখ্যান বলছে(এফ এ ও অনুসারে), সারা পৃথিবীতে খাদ্যের দামের সূচি(ইন্ডেক্স) ২০১৮ কে ১০০ ধরলে, আজ দাঁড়িয়েছে ২৫০ তে। দাম বেড়েছে প্রত্যেকটা জিনিসের – মাছ এবং মাংস, গম এবং অন্যান্য সিরিয়াল, তেল, চিনি, এবং দুগ্ধজাত পণ্যের। ভারতবর্ষে সিপিআই ১৫% ছুঁয়েছে। ক্ষতি কার? এক নম্বরে আছে লেবানন, যেখানে সূচী ৩২০০% ছাড়িয়েছে। আমেরিকা, ইউরোপ কেউ বাদ যায়নি। বেড়েছে ইন্দোনেশিয়া, আর্জেন্টিনা এবং গ্রিসেও। আফ্রিকায় তো অতি অবশ্যই। এইসব দেশে (এবং ইরানে)লোকেরা পথে নেমেছে খাদ্যের দামের বিরুদ্ধে। কারণ কি? অতিমারীর সময়, অর্থাৎ গত দু' বছরে যে কারণে খাদ্যের দাম বেড়েছে, তা সংক্ষেপে হল...

১) আবহাওয়া বা ক্লাইমেট চেঞ্জ
২) বিভিন্ন দেশের খাদ্যের স্টক কমে যাওয়া
৩) তেল এবং গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি

৪) সাপ্লাই চেনে গন্ডগোল
৫) রপ্তানি মার্কেট এবং আমদানী ট্যাক্স

খাদ্যসংকটের এখন যা চেহারা আমরা দেখছি তাহল ওপরের এই পাঁচটা কারণ এক সঙ্গে হওয়া – এবংতাদের একত্র করেছে ইউক্রেনের যুদ্ধ। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে যুদ্ধের জন্য খাদ্যের আমদানী – রপ্তানীর কাজে বিশেষ চাপ পড়েছে। শুধু ইউক্রেন এবং রাশিয়া পৃথিবীর ২% গম রপ্তানী করে। সানফ্লাওয়ার তেল করে ৫৭%। যুদ্ধের আগের আটমাসে, শুধু ইউক্রেনের বন্দর থেকে রপ্তানী হয়েছে ৫ কোটি টন গম এবং অন্যান্য ফুডগ্রেন। যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে ইউক্রেনের বেশির ভাগ খাদ্যশস্য আটকা পড়ে গেছে দেশের ভিতর বিভিন্ন জায়গায়। রেল এবং সড়ক পরিবহনের ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় এবং বন্দরে মাইন লাগানোর ফলে সেই খাদ্যশস্য কোথাও পাঠানো যাচ্ছে না।

বিভিন্ন দেশের ওপর চাপ পড়েছে। সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঈজিপ্ট। ওইদেশের গম আমদানীর ৮০ শতাংশই আসে ইউক্রেন এবং রাশিয়া থেকে। ভারতের অবস্থা খুব ভালো নয়। আমাদের যেটা সবথেকে বেশি প্রভাবিত করেছে সেটা হচ্ছে সানফ্লাওয়ার তেলের দাম। এই দাম বাড়া এবং সাপ্লাইয়ের শরটেজের ফলে যা হয়েছে সেটা হল বিভিন্ন দেশ তাদের রপ্তানী কমিয়ে দিয়েছে, নিজেদের স্টক বাঁচাতে এবং অভ্যন্তরীন বাজারে দাম ঠিক রাখার জন্য। এতে বিশ্বের খাদ্যসংকট যে বাড়ছে বই কমছে না, সেটা সহজেই বোঝা যায়। একটি পরিসংখ্যান অনুসারে, রাশিয়ার আগ্রাসনের পর থেকে প্রায় কুড়িটা দেশ বিভিন্নভাবে খাদ্যশস্য রপ্তানী আটকেছে। এর পুরো মাত্রাটা খাদ্যশস্যের রপ্তানীর বাজারের প্রায় ৬০–৭০ শতাংশের মতো হতে পারে আন্দাজ করা যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে আর একটা বিপদ হয়েছে। রাসায়নিক এবং অন্য সারের দাম আকাশ ছোঁয়াতে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চাষিরা চাষের প্ল্যান বদলে ফেলছেন, কম জমিতে ফসল রোপণ করা হচ্ছে। এতে ভবিষ্যতে খাদ্যাভাব আরো বাড়বে – এই কথাটা এফ এ ও' র প্রধান অর্থনীতিবিদের। রাশিয়া পৃথিবীর সবথেকে বড় রাসায়নিক সারের উৎপাদক। যুদ্ধের পর থেকে স্যাংশনের চাপে রাশিয়ার সার রপ্তানী বন্ধ হতে চলেছে। চীন তো গত বছর থেকেই নিজের দেশের চাষিদের বাঁচানোর জন্য রপ্তানীর ওপর নানারকম প্রতিবন্ধক লাগিয়েছে।

সাধারণ মানুষের কী অবস্থা ? বিশ্বখাদ্যপ্রকল্পের (ডব্লিউএফপি) বিবৃতি অনুসারে, পৃথিবীর অন্তত ৮ কোটি মানুষ একবেলাও খেতে পান না প্রায়, এবং তেতাল্লিশটা দেশের প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ দুর্ভিক্ষের সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে।ইউনাইটেড নেশনের সেক্রেটারি জেনারেল বলেছেন, যুদ্ধ না থামলে আগামী বছরগুলিতে কোটি কোটি মানুষ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হবেন।

এ তো গেল পৃথিবীর কথা। আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে? আর খাদ্যশস্য সম্বন্ধে আমাদের বিদেশনীতিই বা কী বলছে ? প্রথম কথা – এটা সত্যি যে পঞ্চাশের দশকের পিএল ৪৮০ র দিন আমরা দেশ হিসাবে অনেক পিছনে ফেলে এসেছি। আমরা এখন খাদ্যশস্য রপ্তানী করি- এবং ভালো মতোই করি। কিন্তু কতদিন করতে পারব? আমাদের নিজস্ব স্টক খুব ভালো নয়, যদিও গত বছর রেকর্ড হার্ভেস্ট হয়েছিল। তবু আগামী দিনের চেহারা যদি এরকম হয়, তবে ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। ইদানিং পশ্চিমের দেশরা আমাদের বিরুদ্ধে বলতে শুরু করেছে যে আমরা নাকি যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানী করছি না। কিন্তু প্রশ্ন হল, তারাই কী করছে? ফ্রান্স খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যাপারে পৃথিবীতে তিন নম্বর। লাইনে আমেরিকা এবং কানাডা এরাও আছে। এরা আফ্রিকাতে রপ্তানী করে না কেন? করে না, কেননা অভ্যন্তরীণ বাজার বাঁচাতে হবে, তা না হলে কেউই আর ইলেকশন জিতবে না। আমেরিকা যে দয়া দেখিয়ে আমাদের পিএল৪৮০ -র গম দিয়েছিল, তার একটা প্রধান কারণ ছিল,না পাঠালে চাষিরা সেই গম সমুদ্রে ফেলে দিত, দাম ঠিক রাখার জন্য। অতিমারী এবং পর্য্যাবরণ পরিবর্তনের ফলে আজ আর আমেরিকাতে রেকর্ড হার্ভেস্ট হয়নি প্রায় দুবছর হল, কাজেই সেই স্ট্র্যাটেজি আর কাজে লাগানো যাবে না। এই কথাটা অবশ্য ফ্রান্স বা কানাডার পক্ষে খাটে না। তাদের নিজেদের যথেষ্ট আছে। কিন্তু সাবধানের মার নেই তো? কাজেই। তবে এও সত্যি যে ভারত বেশি পরিমাণ সার উৎপাদন না করলে, ভবিষ্যতেও মার খেতে হবে। রাশিয়ার পরেই চীন

পৃথিবীতে সব থেকে বেশি সার তৈরি করে। চীনের ওপর ভরসা নিশ্চয়ই করা যাবে না। এটা আমাদের সরকারের ভাবা উচিৎ।

তবে এটা ঠিক যে যেমন 'ভ্যাক্সিন ডিপ্লোমেসি' হয়েছিল, সেরকমই 'ফুড ডিপ্লোমেসি ' করারও সময় এসেছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে অতিমারীর সময় এই পশ্চিমের দেশগুলোই একদিকে নিজেদের প্রয়োজনের দ্বিগুণ বা তিনগুণ বেশি ভ্যাক্সিন মজুদ করে তারপর 'পৃথিবীকে মুফতে ভ্যাক্সিন দেব' বলে কিছুই দেয়নি প্রায়, তারাই এখন খাদ্যশস্য মজুদ করে বলেভারতের দিকে আঙ্গুল তুলছে। কাজেই, খাদ্য নিয়ে পলিটিক্স করা যতই ঘৃণ্য কাজ হোক না কেন, পৃথিবীর বাজারে আজ তাই করতে হবে। এটাই আজ 'রিয়ালপলিটিক ' ।

লেখা ৪

মেরুদণ্ডের পরিচয়ে চিহ্নিত একজন মানুষ

তপন দে

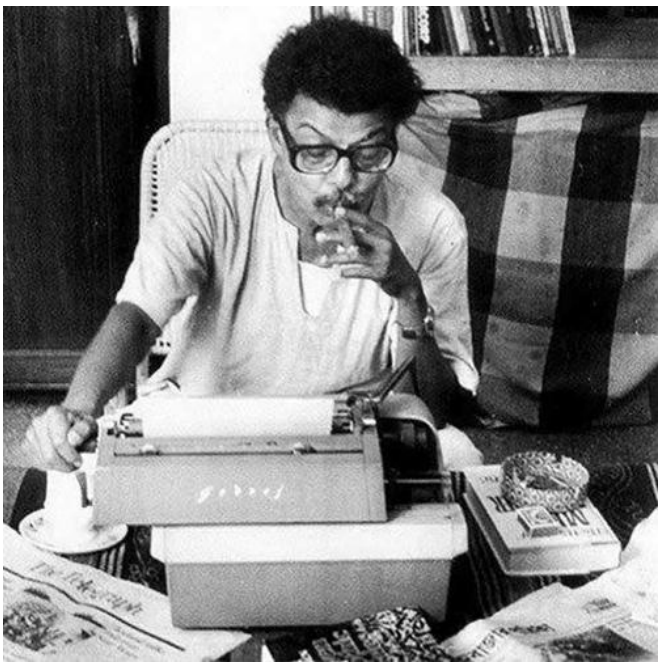

ধুতি আর ফতুয়া গোছের পাঞ্জাবী পরা শেষ প্রজন্মের একজন আদ্যোপান্ত বাঙালি ভদ্রলোকের যে দেখতে দেখতে একশো বছর হতে চলল এটা সেই অর্থে খবর না হবারই কথা, কারণ যেমন গেটাপ বললাম সেরকম কাউকে নিয়ে আমাদের প্রজন্মের কিছু জনের মাথাব্যথা থাকলেও অপেক্ষাকৃত তরুণদের কাছে বিষয়টা তেমন আকর্ষণীয় না লাগাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে এখন, যে মুহূর্তে সৎ আর নির্ভীক সাংবাদিক , যিনি কখনো সংবাদকে মনে করেননি, করেন না রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের অঙ্গুলিহেলনে মুহূর্তে বদলে ফেলতে হয়, বা বদলে ফেলা যায়, মনে করতে শেখেননি খবর আদৌ পাব্লিককে খাওয়াতে না জানলে সাংবাদিকতার প্রথম শর্তই পালিত হল না , তাঁরা আর ডোডোপাখি , যত দিন গেছে, প্রায় একই কিসিমের জীব হয়ে উঠেছেন, তখন এরকম একজন ব্যক্তির শতবর্ষ পূর্তি আদৌ কোনো খবর না হবারই কথা। তবু তাঁকে নিয়ে এই লেখা, কারণ শুধুমাত্র নিজের কব্জির জোর আর চারিত্রিক কিছু বৈশিষ্ট্যের জোরে তিনি যে নিজেকে, প্রাতঃস্মরণীয় না হলেও , সংবাদকর্মী তথা সম্পাদক হিসেবে স্মরণযোগ্য করে তুলতে পেরেছেন --- এটা নিয়ে সন্দেহ ইজ ইকোয়াল টু আপাদমাথা বোকামি ছাড়া কিচ্ছু না।

এই পর্যন্ত লিখে চট করে বলে নেওয়া ভালো যে, তাঁর , গৌরকিশোর ঘোষের, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকের মত প্রকাশের অধিকার নিয়ে অনমনীয়

অবস্থান তাঁকে প্রাণ সংশয়ের মুখোমুখি পর্যন্ত দাঁড় করিয়েছিল।নির্দ্বিধায় কারাবরণ অব্দি করেছেন তিনি এই কারণে ।শোনা যায় নকশালদের খতম তালিকাতে অব্দি নাম উঠেছিল তাঁর । কিন্তু সেই জন্যে নিজের পথ থেকে সরে আসা, বা তাঁকে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারা ? গৌরকিশোরকে যাঁরা চিনতেন , তাঁর স্বজনেরা,তাঁরা বলতে পারবেন, সে কত কঠিন ছিল। মেরুদণ্ড বাঁধা দিয়ে বাঁচা , সে যদি সম্ভব হত মানুষটির পক্ষে , তাহলে প্রৌঢ় বয়সে, নিজের সমূহ অসুস্থতা সত্বেও, ১৯৮৯ সালে ভাগলপুরের দাঙ্গা বা ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙার পর দেশব্যাপী দাঙ্গা তাঁকে টেনে নিতে পারত না দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়া গণ্ডগোলের মধ্যে দাঙ্গা কবলিত এলাকাগুলিতে। শুধুমাত্র খবর সংগ্রহ নয়, তিনি চেয়েছেন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির দূরত্ব পেরিয়ে একে অন্যকে মুখোমুখি বসিয়ে বোঝাতে। পেরেছেন কতটা সেটা প্রশ্ন নয়, বরং এই চাওয়াটাই তো জাত ছিনিয়ে দেয় এক জনের । বিশেষ করে যখন মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিতে চাওয়াটারই নাম হয়ে দাঁড়াতে বসেছে রাজনীতি তথা সামাজিকতা, সমাজনীতি।

কমিউনিজমে আস্থা ছিল না তাঁর । ছিলেন এম এন রায় পন্থী , র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট। ১৯২৩-এ জন্মের পর থেকে বিদ্যাসাগর কলেজের নবদ্বীপ শাখা থেকে আই এস সি পাশ করতে যেটুকু সময় , তার পর থেকে নিত্য নতুন পেশায় যোগ দিয়ে সংসারের দারিদ্র্য মোচন করার চেষ্টায় নেমেছেন । আর সেই সুযোগে চিনেছেন মানুষ। হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন জীবন যন্ত্রণা জিনিসটা আদৌ কোনো রোম্যান্টিক কিছু নয়, তাতে একটা মানুষকে কলে ফেলে ছেঁচে সিধে করার কাজ সমাধা হয়। এইখান থেকেই ধরেছেন কলম। নাম নিয়েছেন কখনো রূপদর্শী, কখনো গৌড়ানন্দ , উপন্যাস লিখেছেন, সাগিনা মাহাতোর মতো গল্প, কিন্তু একচুল নড়েননি নিজের জায়গা থেকে। উলটে ঠাট্টা ব্যঙ্গে জেরবার করেছেন সমসময়ের রাজনৈতিক বাতাবরণকে।অথচ খোলা রেখেছেন মন। খুলে রেখেছেন মনের জানলা।

আমরা যখন বড়ো হয়ে উঠছি, বয়েস বাড়ছে যখন আমাদের, মনের মধ্যে প্রশ্নের আনাগোনা শুরু, তিনি তখনও ছিলেন --- সৌভাগ্য বলে সত্যি যদি কিছু হয়, সত্যিই, তাহলে এটুকুই কি সে ক্ষেত্রে আমাদের জন্যে যথেষ্ট নয় ?

লেখা ৫

শতবর্ষে গৌরকিশোর: ' এই দাহ' র অন্তরালে

গৌতম রায়

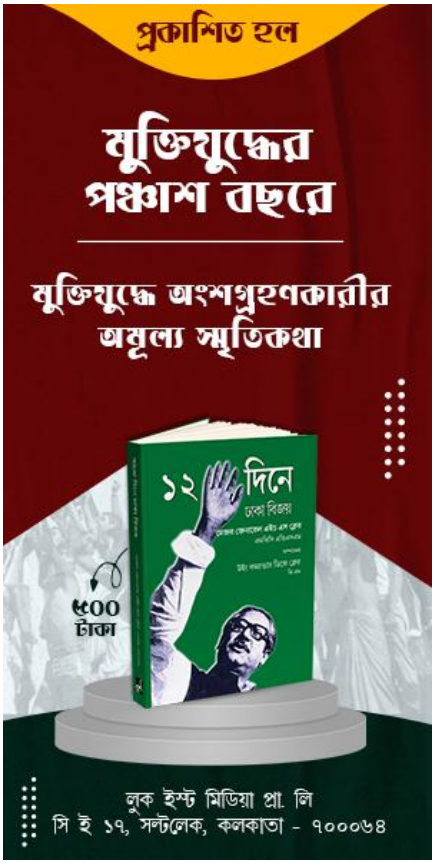

দাহের একমাত্র লক্ষণ কি সন্দেহ ? এই প্রশ্নটা আমাদের সামনে খুব তীব্রভাবে উঠে আসে যখন আমরা গৌরকিশোর ঘোষের 'এই দাহ ' উপন্যাসের প্রায় শুরুর দিকেই লক্ষ্য করি ,' কিন্তু সে খুশির তলায় একটা সন্দেহও পুষে রাখবে। সত্যব্রত যত ই বিশ্বাস করুক, গোলক একেবারে সেরে গেছে, তবু যে কাপে চা খাবে গোলক, সত্য সেটাকে সন্দেহ করবে সে কাপে মুখ দিতে ভয় পাবে। সত্যব্রতকে লোকে ভালো বলবে, মন্দ বলবে, কিন্তু সে যে নর্ম্যাল , এ কথা কেউ শোনাবে না।'

আসলে আমরা যাকে নর্ম্যাল সিচুয়েশন বলে মনে করি, সেটা আমাদের সমাজ জীবনেই হোক, সাংসারিক জীবনেই হোক ,রাজনৈতিক জীবনেই হোক ,কিংবা ব্যক্তি জীবনেই হোক- সেই স্বাভাবিকত্বকে গোটা সমাজ স্বাভাবিক বলে মেনে নেবে এটা এককথায় ভাবাটা ভুল। আমি যেটাকে স্বাভাবিকভাবে দেখছি, আমার কাছে যেটা স্বাভাবিক বিষয় বলে মনে হচ্ছে, অপরের কাছে সেটা নাও মনে হতে পারে।

একজন যক্ষা রোগী চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যে সে যখন যক্ষা মুক্ত হয়ে যাচ্ছে , তখনও সমাজ তাকে 'সমাজে' র মত স্বাভাবিক বলে মনে করছে না। এই যে 'সমাজের মতো স্বাভাবিক' এই জায়গাটা কে গৌরকিশোর তাঁর চিন্তা চেতনায় বারবার প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছেন। আর সেই প্রশ্নের সামনে দাঁড় করাতে গিয়ে যে ঘটনাক্রমগুলিকে তিনি একের পর বিবৃত করেছেন, তার পরম্পরায় এই সমাজের মধ্যে

অবস্থান করে ,একজন নাগরিকের মনে হতে পারে; যক্ষা রোগ মুক্ত একজন কি দুজন মানুষের কাছে জীবন যুদ্ধের একমাত্র উপলক্ষ কেবল যৌনতা?

একটি উপন্যাসে এক ক্লান্ত বিধ্বস্ত সময় আর সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে উঠে আসা শারীরিক যন্ত্রণায় ত্রস্ত দুটি জীবন ,যৌনতা ছাড়া আর জীবনের কোন সাধ খুঁজে পাচ্ছে না-- এখানেই গৌরকিশোরের' এই দাহ' আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয় এক ভয়াবহ প্রশ্ন চিহ্নের সামনে।

সমরেশ বসুর উপন্যাসে যৌনতা বার বার এসেছে সামাজিক জীবনের একটা অংশ, সমরেশ বসুকে অবাধ যৌনতার প্রতিমূর্তি হিসেবে দাঁড় করিয়ে ,আইন আদালতে হেনস্থার কম চেষ্টা করেনি ।কিন্তু ছয়ের দশকের সেই তরঙ্গ আজ শান্ত সমাহিত। নতুন শতাব্দীর দুইয়ের দশকে দাঁড়িয়ে উদার অর্থনীতির নানা টানাপোড়নের মধ্যে যখন আমরা সমরেশের সেই 'রুবি দত্ত' চরিত্রটিকে দেখি, তখন একটিবারও আমাদের কিন্তু মনে হয় না নিছক যৌনতা তাড়িত সমাজকে দেখবার জন্যেই সমরেশ তাঁর কলমকে পরিচালিত করেছিলেন।

সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসবার জন্য একটা সময় সমাজের ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া মানুষের কাছে অবাধ যৌনতা ছাড়া কি আর দ্বিতীয় রাস্তা কিছু নেই, গৌরকিশোরের এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলি যখন কেবলমাত্র যৌনতার বেড়াজালে ঘুরপাক খাচ্ছে, আর যে যৌনতার মধ্যে সৃষ্টির আনন্দ ব্যতীত নিছক শরীরসুখ লুকিয়ে আছে, তখন আমাদের মনে হয় ; এই যৌনতা সর্বস্ব পশ্চিমি সংস্কৃতি নিয়ে আজ যখন আমরা হাজার রকমের সন্দর্ভ রচনা করছি, নানা রকম মূল্যবোধের কথা বলছি, সেই মূল্যবোধকে অনুসরণ- অনুকরণ করে আমাদের যাপন চিত্রকে পরিচালিত করবার স্বপ্ন দেখছি , তখন পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা থেকে শুরু করে, পরিচারিকাকে বিছানায় তোলাই গৌরকিশোরের এই উপন্যাসের নায়কের কার্যতা একমাত্র কাজ হিসেবে উঠে আসছে।

এইক্ষেত্রে মনে হয় মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্য কেবলমাত্র আজকের প্রজন্মের দিকে আঙুল তুলে খুব একটা লাভ নেই ।গৌরকিশোর তাঁর 'জল পড়ে পাতা নড়ে', 'প্রেম নেই', 'প্রতিবেশী'-- এই ট্রিলজি গ্রন্থে বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ককে গভীর থেকে গভীরতর অন্বেষণে ব্রতী হয়েছিলেন। সেই অন্বেষণের ভেতর দিয়ে আমরা প্রবাহমান বাংলার এক সজীবতার ছবি দেখেছি। স্বপ্নের ছবি উপলব্ধি করেছি। সেই উপলব্ধি আর

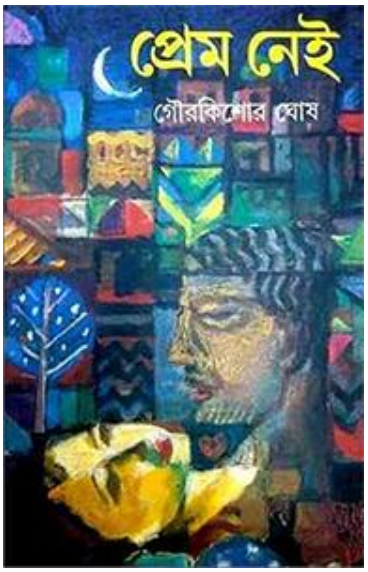

এই গোলক চরিত্রের সুযোগ পেলেই নারীকে শয্যাসঙ্গিনী করে তোলা --এই দুটি ধারা প্রবাহ দিয়ে কখনোই আমরা গৌর কিশোরকে ঠিক মেলাতে পারি না। বুঝে উঠতে পারিনা।

আমাদের মনে এই প্রশ্ন ,এই সংশয় খুব তীব্র হয়ে ওঠে যে, এক অদ্ভুত দ্বৈততায় কি ঘুরতেন ,ভুগতেন গৌরকিশোর? জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে গৌরকিশোরের সংগ্রামী ভূমিকা আমরা দেখেছি ।আবার এই জরুরী অবস্থাকে যারা গোটা ভারতে কায়েম করেছিল, সেই 'নব কংগ্রেস ' তাদেরকে সাতের দশকের গোড়ায় কমিউনিস্টদের ঠেকিয়ে ,ক্ষমতাসীন করবার ক্ষেত্রেও গৌরকিশোরের স্বাজল্যমান ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করেছি ।

তাই সেখানেও প্রশ্ন জাগে, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য গৌরকিশোরের যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য কি ইন্দিরা গান্ধী এবং সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের সংঘাত? কারণ গৌরকিশোরকে আত্মনিবেদিত গরিবের পক্ষের মানুষ তা তার ভাগলপুর দাঙ্গার কালের ভূমিকা কে স্মরণে রেখেও আমরা বলতে পারিনা। আনন্দবাজার পত্রিকায় ধর্মঘটের সময় তিনি যেভাবে শ্রমিক কর্মচারীদের পক্ষে না দাঁড়িয়ে, কেবলমাত্র মালিকের পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই ভূমিকা তাঁর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পক্ষে খুব একটা ইতিবাচক ছিল না।

আবার এই গৌরকিশোর ই অনেক ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের মত প্রকাশের অধিকারের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সেই অবস্থানগুলির মূল লক্ষ্য কিন্তু ছিল বামপন্থীদের রাজনৈতিকভাবে হেনস্থা করা। গৌরকিশোরের মানবতা চিরদিন পরিচালিত হয়েছে ফ্যাসিবাদের সমার্থক হিশেবে কমিউনিজমকে প্রতিষ্ঠিত করতে।তাই প্রগতিশীলতার ভেক ধরতে তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ' নবমানবতাবাদে 'র শরিক হয়েছেন আর অবশ্য ই শ্রেণী অবস্থানে শ্রমিক- কৃষক - মেহনতী জনতার বিপক্ষে থেকেছেন আজীবন ।

লেখা ৬

বৃষ্টি ভেজা সকাল

আদিত্য সেন

অবিনাশ চক্রবর্তী প্রতিদিনের মতো ভোরে উঠে দেখলেন বাইরের আকাশটা মেঘ করে আছে। মনে হল রাতে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। উঠে দরজা খুলে পর্দাটা সরাতেই একটা ভেজা সোঁদা গন্ধ নাকে এসে লাগল। বুঝতে পারলেন রাতে বেশ ভালো রকমের বৃষ্টি হয়েছে। ঘুমের মধ্যে সুনন্দাও টের পায়নি। ঘরে এসি চালানো থাকে বলে চারদিকের দরজা-জানলা ভালো করে বন্ধ রাখতে হয়, নয়তো ঘরটা ঠান্ডা হয় না। যা দিল্লির গরম।

অন্ধকার ঠান্ডা ঘরে না শুলে অবিনাশ চক্রবর্তীর ভালো ঘুম হয় না। ভালো ঘুম না হলে সকালে উঠে শরীরমন চাঙ্গা লাগে না। বাইরে মনে হচ্ছে এখনও বৃষ্টি পড়ছে। অবিনাশের ভোরবেলা সামনের পার্কে হাঁটবার বহুদিনের অভ্যাস। আজ বোধহয় যাওয়া হবে না। অল্প বয়সে অবিনাশবাবু এই আবহাওয়ার তোয়াক্কা করতেন না। বেরিয়ে পড়তেন। কিন্তু এখন বয়স গড়িয়ে পরিণতির সীমায় এসে ঠেকেছে। তার উপর সুনন্দার এবং ছেলেমেয়েদের সতর্ক নজর। অবিনাশবাবুর স্বাস্থ্য নিয়ে তাদের দুঃশ্চিন্তার অন্ত নেই। তাদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে বাইরে যাওয়াটা সবসময় হয়ে ওঠে না।

বাইরে যেতে পারলেন না বলে অবিনাশবাবুর মনটা একটু বিষণ্ণ হয়ে গেল। সবাই শুধু শারীরিক সুস্থতার দিকে নজর রাখে, মনের দিকে কেউ তাকিয়ে দেখে না। এরা বুঝতে চায় না যে প্রকৃতির মধ্যে থাকলে অবিনাশবাবুর মনটা যেরকম সচল ও সজীব থাকে এমন আর কিছুতে নয়। সে কথা অবিনাশবাবু বোঝাতে চেয়ে কাউকে ঠিক বোঝাতে পারেন না।

ইতিমধ্যে চা এসে গেছে। চায়ে চুমুক দিতে না দিতে এক তলা থেকে গার্ড এসে বেল বাজিয়ে খবরের কাগজ দিয়ে গেল। বাড়ির লোকেদের পছন্দ মতো তিনখানা খবরের কাগজ আসে। আজকাল অবিনাশবাবু খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়তে নারাজ। বলেন, ওসব আজেবাজে বক্তৃতা ও খবর মাথায় ঢোকালে আর কিছু পড়ার সময় পাওয়া যায় না। যদিও দু-একটা পত্রিকার সম্পাদকীয়টা পড়ে জানার চেষ্টা করেন পৃথিবীর কোথায় কী ঘটছে এবং কোন দেশের সঙ্গে কী বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছে এবং পরস্পরের লেনদেনে কে কতটা লাভবান হবে। আর রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। বড়ো একটা দেশ ছোটো একটা দেশকে সহজে গিলে ফেলতে পারছে না কেন।

অবিনাশবাবু খবরের কাগজের হেডলাইনগুলি তাড়াহুড়ো করে দেখে নিয়ে সরিয়ে রাখলেন। কোথাও একটা গেলে হত। বন্ধুদের সঙ্গে আজকাল আর আড্ডা দেওয়া হয় না। আড্ডার আলাপ-আলোচনার হইহুল্লোড় ও চেঁচামেচিতে মাথার চিন্তার জট অনেকটা খুলে যায়।

বাইরে বৃষ্টি বেশ জোরেই পড়তে শুরু করেছে। টবগুলোতে জল দেবার প্রয়োজন ছিল। মালি দু-সপ্তাহের ছুটি নিয়ে দেশে গেছে। বৃষ্টি এসে টবগুলি ভিজিয়ে দিয়ে গেল। মনের একটা দুশ্চিন্তা দূর হল। নয়তো হয় নিজেকে জল দিতে হত কিংবা ইচ্ছা না করলে গার্ডকে ডেকে বলতে হত গাছগুলোতে জল দিয়ে দাও। প্রচণ্ড গরমে গাছগুলো জল না পেলে অবিনাশবাবুর মুখের দিকে ও পড়ে।

অবিনাশবাবু ক' দিন ধরেই সারাক্ষণ ছটফট করছেন। একটা ছোটো গল্প লেখার ফরমাশ আছে। কিন্তু কিছুতেই লিখে উঠতে পারছেন না। আগে পথ-চলতি মানুষের সঙ্গে দুটো কথা বললে তার জীবনের গল্প বেরিয়ে আসত। এখন সব দরজা বন্ধ। এখন মানুষই মানুষের সম্পর্কে ভয় পেতে শুরু করেছে। অতিমারি কেটে গেছে লোকেরা বলছে তাও তো কাগজে মৃত্যুর খবর। এমন এক মারণ রোগ সমস্ত

পৃথিবীকে গ্রাস করবে কোনোকালে কেউ তা স্বপ্নেও ভাবেনি। যুদ্ধের চেয়েও যেন ভয়ংকর।

আজকালকার পরিবেশটা গল্প লেখার অনুকূলে নেই। বাইরের ফেরিওয়ালার চিত্কারে অবিনাশবাবুর গল্প লেখার তন্ময়তা কাচের টুকরোর মতো ছড়িয়ে পড়ল। রকমারি চিৎকারের পর চিত্কার। আম-কলা-লিচু নিয়ে যে আসে সেই ফেরিওয়ালার গগনভেদী চিত্কার। কিন্তু আগের মতো এদের সঙ্গে আর গল্প ফেঁদে বসার সুযোগ হয় না। গল্প তো এরাই এদের ঝুড়িতে লুকিয়ে রাখে। রোদ জল বৃষ্টির মধ্যে সারাদিন ঘুরে লোকগুলো পয়সা রোজগার করছে পরিবারকে প্রতিপালন করবে বলে। ওই যে মানুষটি চিত্কার করে চলে গেল ওর জীবনেরও একটা গল্প আছে। ওর ঘরে হয়তো রয়েছে অল্প বয়সী বউ, নিশ্চয় ক' জন সন্তান আর নির্ভরশীল মা-বাবা। কিংবা কে জানে এই বাড়ির ওই নীচের চৌকিদারের মতো হয়তো হবে। বিহারের কোনো এক গ্রামে বউ আর ছেলেকে রেখে এখানে সে চাকরি নিয়েছে পেটের দায়ে। চৌকিদারের ছেলের বয়েস প্রায় তিন বছর। এই তো ক' দিন আগে বাপের কাছে বউ আর ছেলে ঘুরে গেল। তখন ছেলেটা নীচের খোলা বারান্দায় ছুটে ছুটে বেড়াত। আর বাপের সঙ্গে খেলত। এখন সেই ছেলে ভোর হতেই মোবাইলটা হাতে করে ডাক দেয় – বাবা, তুমি কেমন আছ ? ভারতবর্ষ কত দ্রুত বিপুল আকারে পাল্টে যাচেছ। অবিনাশ কি তাঁর ছোটোবেলা এরকম একটা দৃশ্য কল্পনা করতে পারতেন ? চৌকিদারের মুখের দিকে তাকালে অবিনাশবাবুর মনটা কেন জানি একটু নরম হযে ওঠে। কোন সুদূর বিহারে কোনো চাষির ঘরে জন্ম। লেখাপড়া করার ঝোঁক ছিল কিন্তু রোজগারের ধান্দায় সেই নিস্তরঙ্গ পরিবেশ ছেড়ে এখানে নিজে কষ্ট করে একা একা থাকে। চাষবাসের সময় ছুটি নিয়ে একবার গ্রামে যায়। বাপকে সাহায্য করার জন্যে নিজে লাঙল ধরে। এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে।

কার কথা লিখবেন অবিনাশবাবু কিছুতেই ভেবে পাচেছন না আজ। সবার কথাই লিখতে হয় কিংবা ছাত্র জীবনের মতো একটা ব্ল্যাঙ্ক খাতা জমা দিয়ে স্যারকে বলতে হয় - কী লিখব স্যার, কিছুই তো মনে করতে পারছি না। স্যার হয়তো বলবেন, আর একটু চেষ্টা করে দেখতে পারতে। অবিনাশবাবু মাথা নেড়ে হল ঘর থেকে বাইরের আলোতে বেরিয়ে আসেন।

কোথাও গল্প নেই বটে কিন্তু অবিনাশবাবুর নানা জনের জন্য নানা দুশ্চিন্তা। সেটাই একটা গল্প। ওই যে সুন্দরী মেয়েটি, ছেলেদের সঙ্গে দিনের পর দিন ভবিবল খেলে,

তাকে নিয়ে অবিনাশবাবু দুশ্চিন্তার অবধি নেই। কোন বাড়ির মেয়ে এভাবে মানুষ হয়ে ডঠছে। এর মা-বাবা কি জানে যে এই মেয়েটিকে তিনি প্রায়ই নানা রকমের ও নানাভঙ্গির ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখেন। একেক জন তো ওর গালে চলতে-ফিরতে চুমু খায়। হাত ধরে চলে। আইসক্রিম না খাওয়া পর্যন্ত হাত ছাড়ে না। আর একদিন দেখলেন দুজনে অন্ধকারে বসে একটু যেন উন্মত্তপ্রায় হয়ে ডঠেছে। অবিনাশবাবু তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন। তাতেও ওদের কোনো হুঁস ফিরে এল না। এতটা তন্ময় এরা। এক এক দিনে এক একজনের সঙ্গে তন্ময়তা।

এটা ঠিক অবিনাশবাবু নীতিবাগিসশ নন। ছেলেমেয়েদের মেলামেশায় তাঁর কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি জানেন জীবনের অর্থ বোঝা একটু বোধহয দুরুহ। এই মেয়েটির যখন বিয়ে হবে, ওর সবটুকু ওর স্বামীকে ও দিতে পারবে তো। এখনকার এদের কারুর মুখ বা অঙ্গভঙ্গি ভেসে ডঠবে না তো ? রাত্রে ঘুমের মধ্যে এদের স্বপ্ন দেখে অস্থির হয়ে ডঠবে না তো।

সুনন্দাকে এসব কথা বললে ও বিরক্ত হয়। বলে, তোমার সব আজেবাজে চিন্তা। মেয়েটির মা-বাপের চিন্তা নেই আর তুমি এলে যেন এক মস্তবড়ো সমাজ সেবক। অবিনাশ ভাবলেন, সত্যি তো যুগটা কত দূর এগিয়ে গেছে। আমূল পাল্টে গেছে। এখন ছেলেমেয়েরা এসব ব্যাপারগুলি নিয়ে চিন্তাই করে না। বর্তমান নিয়ে থাকে, বর্তমান নিয়েই সুখী হতে চায। অতীতে কার জীবনে কি ঘটেছে তাই নিয়ে এখন আর কেউ মাথা ঠুকে মরে না। এসব ছেলমেয়ে যত বড়ো হবে, সংসারে ঢুকবে, এসব ব্যাপারকে তারা অতটা গুরুত্বই দেবে না। তখন, যা তারা পাবে, যাকে পাবে, তাকে নিয়েই স্বপ্ন দেখবে, ভবিষ্যতে নতুন পথ ধরে এগিয়ে যাবে।

সুনন্দা বলে, তোমার পুরানো সংস্কার ও চিন্তাভাবনা নিয়ে এ-যুগের ইন্টারনেটের ছেলেমেয়েদের বুঝতে চাইলে ঠিক বুঝতে পারবে না। বিচারে কোথাও না কোথাও ভুল হবেই। এখনকার ছেলেরা বিশেষ কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালেই যে তাকে

ভালোবাসে, এমন কথা ভাববার তারা কোনো যুক্তি খুঁজে পায় না। ঘুরতে ভালো লাগছে তাই ঘুরছি, রেস্তোরাঁয় বসে দুজনের খেতে ভালো লাগছে তাই খাচিছ। এর বিশেষ কোনো অর্থ আছে বলে নয়।

অবিনাশ মানতে চান না, বলেন, চিরকালের যে ভাবনা সেটা চিরকালই থাকবে, কখনও বদলাবে না। কোনো লোকেরই জীবন ও মৃত্যুকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করার ক্ষমতা নেই, কোনোকালে থাকবে না। ফিলিং-এর অদলবদল হতে পারে। সেখানেও যে শুধু ছাঁচে-ঢালা চিন্তাধারা প্রাধান্য পাবে মানুষের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের ইতিহাস দেখে তা মনে হয় না। সুনন্দা বলে - তুমি ইমোশনকে এত প্রাধান্য দাও বলেই তোমার মনে এসব কথা ওঠে। আজকাল ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি বাস্তবমুখী। আধুনিক ব্যবহারিক জীবনে এটারই প্রভাব দেখতে পাই আমরা।

অবিনাশ বাধা দিয়ে বললেন, না সুনন্দা, জীবনের অনেকটা তো পেরিয়ে এলাম। তাই আজকাল এসব কথা ভাবি। একটা কথা দিনের আলোর মতো সত্য। বর্তমানের ঘটনাই যেমন অতীত হয, আর তেমনি বর্তমানই ভবিষ্যত্। মানুষের আর কিছু না থাকুক তার মনের গোপন গহ্বরে সব কিছু জমা থাকে। সে ভবিষ্যতে হাত-পা ছুঁড়ে হয় কাঁদে, না হয কাছে ডাকে। আমার বিশ্বাস তার থেকে রেহাই পাবার কারুর কোনো ডপায নেই।

সুনন্দা হেসে বলে, ঠিক আছে, আর এক কাপ গরম চা এনে দিচিছ। বারান্দায বসে অশ্বত্থ গাছের দিকে তাকিয়ে পাখির কলকলানি শোনো। তাদের ডাক শুনে অন্তত যন্ত্রণায় কাতর হবে না। অবিনাশবাবু হেসে বললেন , ঠিক আছে সেটাই ভালো।

বৃষ্টি থেমে গেছে। এখন গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায় রোদ্দুরের ঝিকিমিকি খেলা। কী সুন্দরন যে দিনটা সেজে ডঠেছে। এসময এক কাপ চা হলে মন্দ হত না। তাহলে বাইরে গিযে বসি। মানুষের মনের কথা চিন্তা করতে শুরু করলে এসব ওলটপালট ব্যাপার থেকে রেহাই নেই। আমি তো আগের প্রজন্মের মানুষ। তাই মিছিলের মতো মানুষের সুখদুঃখ মনের ক্যানভাসে ভেসে উঠতে থাকে।

লেখা ৭

প্রসঙ্গ ভারতীয় হকি এবং কিছু কথা

প্রসেনজিৎ মজুমদার

আমার এই গল্পের সূচনা ১৯২৮ সালে নয় বরং ১৯৮০ সালে। আমি তখন ক্লাস সেভেন। শুরু হল মস্কো অলিম্পিক। সেবার রাজনৈতিক কারণের জন্য বেশ কয়েকটি ভালো দল অলিম্পিক বয়কট করেছিল। ভারতীয় হকি দল তখন বিশ্বের চতুর্থ ---ঠিক আজকের মতোই। পৃথিবীর সেরা দলগুলোর মধ্যে পাকিস্তান, পশ্চিমজার্মানি, হল্যান্ড সহ অনেক দলই তখন সেই টুর্নামেন্ট বয়কট করেছিল। ফলে বিশেষজ্ঞদের মতে সোনা জয়ের ক্ষেত্রে ভারতই ফেভারিট ছিল। কোনো একটি খেলার পত্রিকায় লেখা হয়েছিল 'ফোর্থ বয় ভারতের এবার ফার্স্ট হওয়া উচিত' । অর্থাৎ চ্যাম্পিয়ন হলে ভালো, নয়ত লোকে দুয়ো দেবে। প্রসঙ্গত জানাই ১৯৭৬সালের মন্ট্রিল অলিম্পিকে ভারত সপ্তম হওয়ার জন্য দেশ জুড়ে হইহই পড়ে যায়। ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিকের আসরে তাও ব্রোঞ্জ জুটেছিল ভারতের। ফলে সেই ১৯৬৮ সালের পর থেকে ভারতবাসী অলিম্পিক হকিতে সোনার পদকের জন্য অপেক্ষা করছিল। ১৯৬৮ সালে শেষ সোনা।

ঠিক এইরকম পরিস্থিতিতে কিউবাকে ১১-২ এবং তানজানিয়াকে ১৮-০ গোলে উড়িয়ে অলিম্পিক অভিযান শুরু করল ভারত। শেষ পর্যন্ত সেবার ফাইনালে উঠল ভারত ও স্পেন। ফাইনালে সে এক রুদ্ধশ্বাস লড়াই!! যাঁরা ঐ ফাইনালটির রেডিও ধারাভাষ্যটি

শুনেছিলেন তাঁরা জানেন কী ভয়ংকর টেনশন ছিল ভারতীয়দের ঐ ম্যাচটি ঘিরে। ভারত ৪-৩ গোলে স্পেনকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। ভারত যখন ৪-৩ গোলে এগিয়ে, খেলা শেষ হতে তখন আর কয়েক মিনিট বাকি। পরের পর পেনাল্টি কর্নার আদায় করছে স্পেন। যেকোনো মুহূর্তেই ঘটতে পারে অঘটন ! 'ভারতীয় গোলরক্ষক বাংলার ছেলে বীরবাহাদুর ছেত্রী পরের পর গোল আটকাচ্ছেন। এই বুঝি পেনাল্টি স্ট্রোক পেয়ে গেল স্পেন। ধারাভাষ্যকার উত্তেজনায় সেকেন্ড গুনছেন 'ফিফটি এইট, ফিফটি নাইন অ্যান্ড ইন্ডিয়া ওন দ্য অলিম্পিক গোল্ড এগেইন' ।

তারপর কেটে গেল চল্লিশ বছরের বেশি সময়। অলিম্পিক হকিতে ওই ছিল আমাদের শেষ পদক। আর ১৯৬৮ সালের সোনাই ছিল আমাদের শেষ সোনা। তারপর ১৯৮০র সোনা। বলা যায় করোনার জন্য গত বছর হওয়া ২০২০সালের বিলম্বিত অলিম্পিকে ভারতীয় হকির ব্রোঞ্জ প্রাপ্তি কিন্তু যথেষ্ট খাঁটি --- এমনকী '৮০র সোনার থেকেও। এই পদক ঠিক অর্ধশতাব্দী আগের মিউনিখ অলিম্পিকের ব্রোঞ্জ পদকের মতোই। বিশ্বর‍্যাঙ্কিং-এ ভারত এখন চার নম্বরে। পাকিস্তান প্রথম দশে নেই। অথচ ১৯৭৫ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারত আর কখনও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি।

১৯৮১ সালে নিজের মাঠে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে উঠতে পারেনি ভারত। হয়েছিল পঞ্চম। ১৯৮৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হওয়া অলিম্পিক ছিল আর একটা বয়কটের অলিম্পিক। এবার রুশঘনিষ্ঠরা বয়কট করে অলিম্পিক। কিন্তু নির্জোট আন্দোলনের সমর্থক ভারত সেই অলিম্পিকে অংশ নিয়ে হয়েছিল পঞ্চম, কারণ বিশ্ব হকির সেরা দলগুলোর প্রায় সবাই সেই অলিম্পিকে অংশ নিয়েছিল। ভারত এরপর ১৯৮৫তে হকি বিশ্বকাপে দ্বাদশ স্থান অধিকার করে এবং ১৯৮৬তে এশিয়াডে সোনা রুপো নয় , পায় ব্রোঞ্জ। এই প্রতিবেদকের সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে গুরবক্স সিং বলেছিলেন 'ভালো অ্যাস্ট্রোটার্ফের মাঠের পর্যাপ্ত পরিমাণ অভাব, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু নতুন নিয়ম চালু হওয়ার জন্য ইয়োরোপিয়ানদের সুবিধা, ভারতের হকি প্রোডিউসিং রাজ্য পাঞ্জাবের খালিস্থানি আন্দোলনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং থৈবা সিং সহ বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়দের সাসপেনসনের জন্য ঐসময়ের ভারতের হকি পিছিয়ে পড়েছিল ' । কিন্তু তারপর সরকার ও ভারতীয় হকিসংস্থার ঐকান্তিক চেষ্টায় অনেক দেরিতে হলেও অনেক বাধাবিঘ্নর মধ্যে দিয়ে নিজেদের মতো করে একটু একটু করে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে ভারতীয় হকি।

পাকিস্তান কিন্তু তলিয়ে গিয়েছে প্রথম দশের বাইরে। ভারতের দ্বিতীয় দল এশিয় কাপে রানার্স হয়। প্রথম দল সহজেই অলিম্পিক বা বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করে। ভারতীয় গোলরক্ষক পি আর সৃজেশকে এখন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষকদের একজন বলে ধরা হয়।

পাশাপাশি ভারতের মহিলা হকি দলও অলিম্পিকে ফের চতুর্থ হতে লাগাল প্রায় ৪১বছর। রানি রামপালদের গত বছরের অলিম্পিকে চতুর্থ হওয়ার আগে ভারতের মহিলা হকিদল শেষবার চতুর্থ হয়েছিল কী আশ্চর্য ১৯৮০র মস্কো অলিম্পিকেই।এখন প্রশ্ন হল ,ভারতীয় হকির ঘুরে দাঁড়ানোর কারণ কি ? এপ্রসঙ্গে ক্রীড়া সাংবাদিক কুণাল দাশগুপ্ত বলেন, ‘ নতুন শতাব্দীতে একাধিকবার যুব বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া। একঝাঁক তরুণ তুর্কির উঠে আসা এবং ভারতীয় হকিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। দ্বিতীয়ত , সাইএর সফল আগমন। তৃতীয়ত, হকি খেলার উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করা । চতুর্থত, প্রথমে ভারতীয় ফুটবলের জাতীয় লিগের ধাঁচে হকি লিগ চালু করা ---যেটা ইএসপিএন দেখাত একসময়। পরবর্তী সময়ে আইএসএলের ধাঁচে হকি লিগ চালু করা’ ।

কুণাল যদিও বললেন, ‘পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের বাদ দিয়ে ঐ লিগ খানিকটা গ্ল্যামারহীন ঠিকই তবু হইহই করেই শুরু হয়েছিল। বাঙালি যেহেতু হকিতে তেমন উৎসাহী নয় তাই বাংলার মিডিয়ার এনিয়ে উৎসাহ কম।এখন যদিও সেই লিগেও ভাঁটার টান। বিশ্বমানের খেলোয়াড়রা আর আগের মতো আসছেন না--- বিশেষত করোনার জন্য খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই লিগ, তবুও তরুণ খেলোয়াড়রা আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলে এবং ড্রেসিংরুম শেয়ার করে অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে বইকি। তবে আর একটা জিনিসও বলতে হবে, সেটা হল ভারতীয় হকি ফেডারেশনের কর্তারা যে অকারণে গো-সমস্যায় না ভুগে এই শতকের প্রথমার্ধে ইয়োরোপ অস্ট্রেলিয়ার কোচের হাতে জাতীয় দলের দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন তা প্রশংসার দাবি রাখে। এছাড়াও দেখবেন ভারত বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। দেশে ও বিশেষ

করে ভুবনেশ্বরে চ্যাম্পিয়ন' স ট্রফি সহ বিভিন্ন টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছে ভারতীয় হকি ফেডারেশন , যা আখেরে ভারতীয় হকির পক্ষে গিয়েছে।

বিদেশের হকিলিগেও তো অনেকে খেলেন শুনি। এগুলো ভারতীয় হকিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলেই আমার মত'। থামলেন কুণাল। কুণালকে মনে করিয়ে দেওয়া হল ঠিকএইমুহূর্তে প্রো-হকিলিগে আমাদের পুরুষ ও মহিলা হকি দল বেশ ভালো খেলছে। কুণাল বলছিলেন ' আশা করি ভারত আবার অলিম্পিক গোল্ড পাবে। আসলে খাঁটি সোনার পদক এসেছিল তো সেই ১৯৬৮সালে । মস্কোর সোনা খাঁটি নয়, কারণ বুঝতেই পারছেন বিশ্বসেরারা উপস্থিত ছিল না। বরং এবারের অলিম্পিক ব্রোঞ্জ মস্কোর সোনার থেকেও খাঁটি' । বিশেষজ্ঞরা আশাবাদী বিশ্বহকির চার নম্বর ভারত একদিন না একদিন একনম্বর। দরকার কেবল ফুটবলের মতো বিনিয়োগ। ভারতীয় হকি ফেডারেশনের কর্তারা, আপনারা শুনছেন কি ?

বৃষ্টি

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়ায়

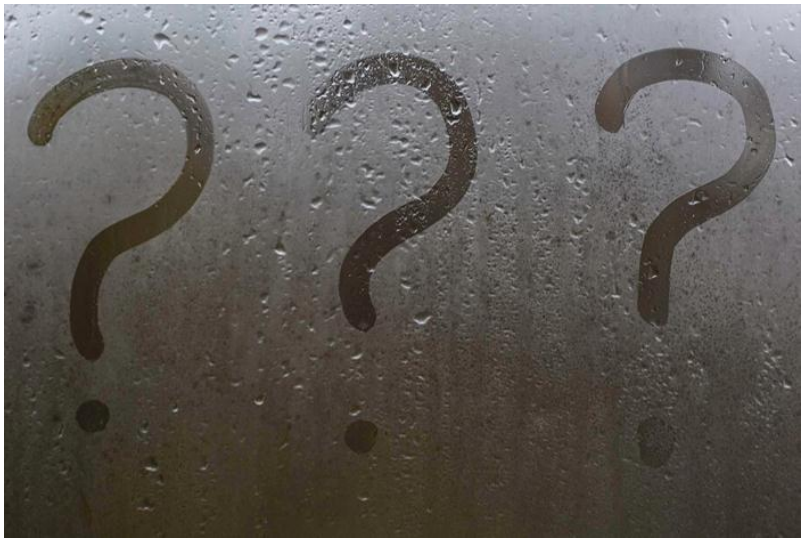

কীভাবে বর্ষার কথা লিখি!
যেভাবে মিথ্যে বলতে শিখি!
ধর্ষণ বৈধ হলে,
বিবাহিতা রক্ত পড়লে,
যেভাবে পুণ্যের চোখে ঝুঁকি!

আমি কিছুতেই'পোয়েটিক'
হতে পারছি না।
উঁহু, দুঃস্বপ্নকে আমি,
রূপান্তরিত-কাব্য বলতে
পারছি না।
মশারি ইদানিং আমাকে ডিসটার্ব করছে খুব!
শ্রেণীশত্রু বানিয়েছে,
ঘুমোতে দিচ্ছে না।

কীভাবে কদমফুল লিখি!
যেভাবে গুমোট ফ্রেমে,
নবধারাজল মেখে
সে এসে দাঁড়াল প্রেমে,
যেভাবে সত্যি বলতে শিখি

লেখা ৯

কোভিডের পরে বাংলা কাগজ

অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেলুদা ওরফে প্রদোষ মিত্র হেমাঙ্গ হাজরার বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার জন্য চলে এলেন সবজান্তা সিধু জ্যাঠার বাড়ি।হাজরা বাবুর নাম শুনে সিধু জ্যাঠা বের করে ফেললেন ১৯৬২ সালের ভলিউম যেখানে তিনি নিজের হাতে খবরের কাগজের কাটিং রেখেছিলেন আর ফেলুদাকে হেমাঙ্গবাবু সহ ভবানন্দ এবং তার অপগন্ড চ্যালার ইতিহাস বাতলে দেন।শুধু সিধু জ্যাঠা নয় আমরাও গুরুত্বপূর্ন খবর নিজেদের প্রয়োজনে লাগবে বলে কেটে রাখতাম।প্রিয় খেলোয়ারদের ছবি খবরের কাগজ থেকে কেটে অনেক বন্ধুবান্ধব তার নিজের ঘরে টাঙিয়ে রাখত।মাসিক ম্যাগাজিনের চকচকে পেপারে ছাপা সিনেমা আর্টিস্টদের ছবির কাটিং ছিল পাড়ার সেলুনের ইউ এস পি। কোভিড আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।তার প্রভাব দেখা দিয়েছে অর্থনৈতিক সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনে। ছোটবেলায় রিডিং পড়া শেখার পর পরই বাড়ির বড়রা খবরের কাগজ পড়ার জন্য আমাদের উৎসাহিত করতেন।কিন্তু আজ পরিস্থিতি বদলে গেছে ডিজিটাল মিডিয়ার আগমনে খবরের কাগজ আজ কোনঠাসা।

কথা হচ্ছিল বিখ্যাত বাঙলা দৈনিক কাগজের ভেন্ডার অমল শীল বাবুর সাথে।তার অভিজ্ঞতা বলছে বাংলা ভাষায় পাঠকের সংখ্যা খুব কমে যাচ্ছে।তার কারন বর্তমানে শহরের নব প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের বিরাট অংশ পড়াশুনা করছে ইংলিশ মিডিয়ামে।তাই আমাদের কিশোর বেলায় খবরের কাগজের খেলার পাতা দেখার উৎসাহ এই প্রজন্ম খুঁজে নিচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায় বা ইংরাজি খবরের কাগজে।এখন আর দশটা পাঁচটার বাঁধা ধরা চাকরি নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কম করে প্রতিদিন

১২ ঘন্টা কাজ করে গ্রাসাচ্ছাদন করতে হচ্ছে পরিবারের উপার্জনকারীকে। তাই লোকাল ট্রেনে জানলার ধারের সিট খুঁজে নিয়ে দৈনিক কাগজ উলটে দেখা,কিছুক্ষনের মধ্যেই গোটা পত্রিকার প্রতিটি পাতাই কম্পার্টমেন্টের নানা কোনায় ছড়িয়ে পড়ার অবকাশ আজ নেই।আর তাই নির্দিষ্ট স্টেশনে নেমে যাওয়ার আগে ৫ এর পাতাটাকে খুঁজে না পাওয়ার আক্ষেপটাও হারিয়ে গেছে।সওদাগরি অফিসে বড়বাবুর টেবিল থেকে সিনেমার পাতাটা নিয়ে আসার বিলাসিতা আজ আর কোন পিয়ন করে না।বর্তমানে সরকারি অফিসেও খবরের কাগজে রাজনৈতিক প্রতিবেদন বা সম্পাদকীয় নিয়ে আলোচনা শুনতে পাওয়া যায় না।

কথা হচ্ছিল জয়ন্তদার সঙ্গে। সুদীর্ঘ ৩০ বছর ধরে তিনি হাওড়া শহরের বিভিন্ন প্রান্তে খবরের কাগজ,মাসিক,পাক্ষিক পত্র পত্রিকা পৌঁছে দিয়ে আসছেন। তাঁর কথায়, বাংলা কাগজের আর সেরকম কাটতি নেই।মাসিক বা পাক্ষিক পত্র-পত্রিকার অবস্থা আরও করুন।৩১/০৩/২০১৯ এ মোট বাংলায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ছিল ৪০৩৯টি তার মধ্যে দৈনিক ১৯৭,মাসিক ১০৭৭,পাক্ষিক ৮৮০,ত্রৈমাসিক ৬৫৫ বাৎসরিক ৪০ এবং বাকি অন্যান্য।গোদের ওপর বিষফোঁড়া হল কোভিড।অতিমারী চলাকালীন ছাপানো কাগজের প্রতি জনসাধারণের মনে একধরনের ভীতি কাজ করতে থাকে। অনেকে মনে করেন ছাপানো কাগজের ডেলিভারির সময় বিভিন্ন লোকের হাতের স্পর্শে কোভিড ছড়িয়ে পরতে পারে।তাই খবরের কাগজকে স্যানিটাইজড করার জন্য নানান মজাদার উপায় উদ্ভাবন করতে দেখা যায় সাধারন মানুষকে।কেউ সেটিকে ইস্ত্রি করে নিচ্ছেন তো কেউ স্যানিটাইজারে চুবিয়ে রোদ্দুরে শুকিয়ে নিয়েছেন,এই দৃশ্য হামেশাই দেখা গেছে।

এই সময় বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিন গুলো অনলাইন ভার্সান প্রকাশ করতে থাকে।কোভিডের আগে এবং পরে বাংলা কাগজের সারকুলেশনের দিকে নজর দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।২০১৮-২০১৯ সালে বিভিন্ন বাংলা পত্র পত্রিকার সারকুলেশনের সংখ্যার একটা হিসাব মোটামুটি এইরকম দৈনিক-৪৫৬৩০৮৯,মাসিক-৮০৮১৪৬,পাক্ষিক-১৫০১২৫৮ এবং ত্রৈমাসিক,ষান্মাসিক,বাৎসরিক ও অন্যান্য সব কিছু সহ মোট ৯২৮৫৩৯৯।অন্যদিকে কোভিড পরবর্তী পর্যায়ে ২০২০-২০২১সালে

বাংলা পত্র-পত্রিকার মোট সারকুলেশনের সংখ্যা ছিল ৭৬০৯১৩০,যার মধ্যে দৈনিক-৩৫৬২৯৩৬,মাসিক-৫৯৭২০১,পাক্ষিক-১২৮৯৩৪৯ বাকি ত্রৈমাসিক,ষান্মাসিক,বাৎসরিক সহ অন্যান্য ধরনের পত্রিকা। নিউজপ্রিন্টের অভাব,ছাপানোর খরচা প্রচুর বেড়ে যাওয়া, ঠিকমত বিজ্ঞাপন না পাওয়ার জন্য প্রকশনা সংস্থাগুলি কাগজ ছাপতে অনীহা প্রকাশ করছে।বেশ কয়েকটি বাংলা সংবাদ পত্রের ভরসা এখন শুধুমাত্র সরকারী বদান্যতা।

আজ হাতের মুঠোয় দুনিয়া চলে এসেছে। ঘুম থেকে ওঠা থেকে ঘুমতে যাওয়া পর্যন্ত সব সময়েই প্রতি মুহূর্তের খবর আপনার মুঠোফোনে চলে আসছে।আর খবরের বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে ডিজিটাল মিডিয়াতে রয়েছে অনেক আর্টিকেল তার সঙ্গে খবরের কাগজের বাছাই করা সীমিত সংখ্যক বিশ্লেষণ আমাদের মনের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না।' প্রযুক্তি একদিন মিডিয়াকে এনেছিল এখন প্রযুক্তিই একে দূরে নিয়ে যাচ্ছে' বক্তব্য বিশেষজ্ঞ ডেভিড হকের। হক কথ অবশ্যই এবংএই অসম প্রতিযোগিতায় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কাগজ কতদিন টিকে থাকবে তা বলা মুশকিল। প্রথম যখন টেলিভিসন এসেছিল তখন গেল গেল রব উঠেছিল।কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দুটি মাধ্যম পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছিল।তবে যেকোনো ভাষার প্রকাশিত একটি কাগজও বন্ধ হয়ে যাওয়া কখনই কাম্য নয়। "এব্রি টাইম অ্যা নিউজ পেপার ডাইজ,ইভেন অ্যা ব্যড ওয়ান,দ্য কান্ট্রি মুভস অ্যা লিটল ক্লোজার টু অথোরাইটারিজম। " ্বলছেন আরেক বিশেশিজ্ঞ রির্চাড ক্লুগার। যাই হোক, বাংলা খবরের কাগজ কোভিড পরবর্তী পর্যায়ে ডিজিটাল মিডিয়াতে একাত্মীভূত হয়ে উঠবে কিনা সেটাই দেখার।

লেখা ১০

জল পড়ে পাতা নড়ে

বিশ্ব মণ্ডল

যেমন দেখেছি আকাশ অথবা বজ্র- বিদ্যুৎ সহ
বৃষ্টিপাত --- সব সম্পর্কের শেষ দেখেছি ;
তুমি আমার বিনাশ চাও।

বিপর্যস্ত , ঘূর্ণাবর্তে আবদ্ধ ...

দেখি প্রহসন সর্বত্র চলছে ----
মানুষের সমূহ বিপদ জেনো ।

(গৌরকিশোর ঘোষ শতবর্ষের শ্রদ্ধা)

বৃষ্টির ফোঁটাগুলো

রাজা মজুমদার

বৃষ্টির রাশ শেষে
ফোঁটাগুলো কার্নিশে
ঝুলে থাকে। মনে হয়
শাখ রঙা হাত এসে
খালিপিঠে চুল খুলে
উদাসীন চোখ মেলে
দেখা দেবে জানলার পাশে

বেলা চড়ে,রোদ বাড়ে
শূন্যতা ভরে জানলার পারে।

তার কথা, তাহাদের কথা থাকে পড়ে।
ভাঙা আশ শুষে যায়,
রোদ্দুরে মিশে যায়
রেখে যায় কার্নিশ জুড়ে দাগ
বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ।

লেখা ১২

ভেন্টিলেশনে কলকাতার সিনেমা হল ... চাই অক্সিজেন

কিঞ্জল রায়চৌধুরী

বিনোদন বলতেই আমাদের মতো বিশ শতক যখন শেষের পথে, তখন যাদের জন্ম তাদের কাছে প্রথমে আসে সিনেমার নাম, আর সিনেমা মানেই সিনেমা হল। তবে একুশ শতকের তৃতীয় দশকে পৌঁছে সিনেমার সঙ্গে সিনেমা হলের সম্পর্কের এই রসায়ন টিঁকছে না অনেক ক্ষেত্রেই। প্রতিষ্ঠিত বহু সিনেমা হল 'বিলুপ্ত' হয়ে গিয়েছে, কিছু বিলুপ্তির পথেই পা বাড়িয়ে। এর কারণ খতিয়ে দেখতে গেলে হাতে হাতে স্মার্টফোন, ওটিটি প্ল্যাটফর্মে নিজস্ব সময় ও সুযোগ বা রুচি অনুযায়ী মুভি দেখার প্রবণতা এসব প্রসঙ্গ তো আসবেই ; এগুলো যেমন হল বন্ধ হবার একটি দিকের কারণ, তেমনই অস্বীকার করার উপায় কী যে, আমাদের মতো অসংখ্য বাঙালির রক্তে নিহিত আত্মবিস্মৃতিও এই কারণগুলিকে ত্বরান্বিত করছে। তবু দর্শকরা যে হলমুখো হচ্ছেন না, হলেও সীমিত একথা যেমন ঠিক, তেমনই আবার দ্বিগুণ তিনগুণ টিকিটের দাম দিয়ে মাল্টিপ্লেক্স ভরাচ্ছেন ফিল্মি দর্শকদের একটা বড়ো অংশ।

সিনেমা এবং সিনেমা হলের জন্ম প্রায় একসঙ্গেই, একথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই ! অথচ আশ্চর্যজনকভাবে অতীতের বহু অবহেলিত নিদর্শনের মতোই বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী অগণিত সিনেমা হলগুলোও আজ উধাও-প্রায়। কলকাতার কয়েকটি সিনেমা হলের বর্তমান পরিস্থিতি সচিত্র তুলে ধরলে দেখা যাবে ৮০ বছরেরও বেশি ইতিহাস চূড়ান্ত অবহেলা নিয়ে পড়ে রয়েছে।

প্রখ্যাত ফিল্ম বিশেষজ্ঞ চন্ডী মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কলকাতার সিনেমা হলের জন্ম ও মৃত্যু' শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন কীভাবে আমেরিকা ও ফ্রান্সে বায়োস্কোপ এবং ধীরে ধীরে বড়ো ব্যবসায়ীদের হাত ধরে হলিউডের জন্ম হল। ঔপনিবেশিক ভারতের মুম্বই (তৎকালীন বোম্বাই)-তে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ফাদার ল্যাফোর ম্যাজিক লন্ঠনের সাহায্যে ছবি প্রদর্শন দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে জে.এফ.ম্যাডান কীভাবে তাঁবু খাটিয়ে বায়োস্কোপ প্রদর্শনীর ব্যবসায় নামলেন তারও বিস্তারিত বর্ণনা আমরা পাই। ম্যাডান সাহেবেরই প্রতিষ্ঠিত সিনেমা হল এলফিনস্টোন

পরবর্তীকালে ভারতীয় ব্যবসায়ীর কাছে হস্তান্তরিত হয়ে নাম নেয় 'মিনার্ভা'। পাশাপাশি ম্যাডান সাহেবের বায়োস্কোপ কলকাতার থিয়েটারের মঞ্চেও প্রভাব ফেলেছিল। থিয়েটারের চলমান দৃশ্যের টুকরো টুকরো ছবি তুলে সেইসব ছবি নাটকের মাঝখানে বা শেষদিকে প্রদর্শন করতেন হীরালাল। সেই থেকেই কলকাতার সিনেমার প্রতি আকর্ষণ শুরু। এরপর থেকে কলকাতার সিনেমা পাড়ার এক সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে --যার একদিকে রয়েছে হাতিবাগান তো অন্যদিকে ভবানীপুর। উত্তর-দক্ষিণ-মধ্য কলকাতায় গড়ে ওঠা সেইসব সিনেমা হলগুলি এখন কোথায়? সেটাই খোঁজবার চেষ্টা করেছিলাম বাঙালি চলচ্চিত্রপ্রেমীর দায়বদ্ধতা থেকেই। রইল তারই কয়েকটি ঝলক।

উত্তর কলকাতার হাতিবাগানে ম্যাডান সাহেবের প্রতিষ্ঠিত কর্নওয়ালিশ ও ক্রাউন এই দুটি হলকেই কলকাতার প্রথম প্রতিষ্ঠিত সিনেমা হল বলা যায়। কর্নওয়ালিশেই প্রথম পূর্ণাঙ্গ ফিচার ফিল্ম দ্যাখানো শুরু হয়। ১৯৩৫ সালে এই কর্নওয়ালিশ হলের নামই পরিবর্তিত হয়ে নবকলেবরে জন্ম নেয় 'উত্তরা'। পাশেই আরো একটি সিনেমা হল 'শ্রী'। দুঃখের বিষয়, বাংলার প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল যে সিনেমা হলে, উত্তর কলকাতার 'সিনেমাপাড়া' খোদ হাতিবাগানের সেই 'উত্তরা' হলের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। তার জায়গা দখল করে শোভা পাচ্ছে 'সিটি মার্ট'। পাশের 'শ্রী' হলটিও ভ্যানিশ ! সেখানে এখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ 'কেএফসি'। এই দুটি বিপণনকেন্দ্রকে সংযোগ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরো একটি শপিং কমপ্লেক্স --'উত্তরা' মার্কেট। জুতোচটি জামাকাপড় গয়না সস্ট টয়ের ঢালাও বিপণিগুলির পাশে যে নামটি এখনও নিজের অস্তিত্বটুকু রাখতে চাইছে, তার জন্য একটা স্মৃতিচিহ্নও কি রাখা যেত না ?

ইতিহাসের দিকে আরেকটু এগোলে জ্বলজ্বল করছে 'মিনার'। যদিও ভেতরে পা রাখলে বোঝা যায় উজ্জ্বলতাটুকু বাইরেই, ভেতরে তাকেও গ্রাস করছে বিস্মৃতির সংক্রমণ। তারই মধ্যে হার্টবিটটুকু চালু রয়েছে শুধু। ঠিক তার উল্টোদিকে কয়েক পা হাঁটলেই মমির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে 'দর্পণা'। সৎকারের আয়োজন এখনও হয়নি, তবে হবে নিশ্চয়ই! প্রশ্নটা না রেখে পারা যায় না –-- এত, ইতিহাসবিমুখতা না বলে বলি বরং ইতিহাস- বিতৃষ্ণা, কিসের জন্য ? বাংলার সেই যে অন্যতম প্রথম 'সিনেমাপাড়া', তাকে সংরক্ষণের বিন্দুমাত্র দায় কি কারুর নেই? উত্তরে 'দর্পণা'-র মরচে ধরা সাইনবোর্ড থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস আর খানিকটা ধুলো ঝরে পড়ল।

উত্তর কলকাতার হাতিবাগানের মতোই দক্ষিণ কলকাতার সিনেমা পাড়া হয়ে উঠেছিল ভবানীপুর। ম্যাডান সাহেবের সঙ্গে পাল্লা দিতে তখন বাঙালি 'সিনেমাওয়ালা'-রাও মরিয়া। তৈরি হচ্ছে একের পর এক সিনেমা হল। এই সময়েই ভবানীপুরের বিখ্যাত 'রসা' থিয়েটার কিনে নেন পূর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি এই হলেই নবকলেবরে জন্ম নেয় 'পূর্ণ' সিনেমা। সেই পূর্ণ সিনেমা আজ পোড়ো বাড়ির মতো দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধ ইমারতের ঝুলে পড়া চোয়ালের মতো আলগা হয়ে ঝুলে রয়েছে খড়খড়ির কাঠগুলো। দেয়ালের দাঁত বার করা ইট সাক্ষী দিচ্ছে বুকে জমা চলচ্চিত্রের স্থবির ইতিহাস। যেন জোর করেই তার গতিপথ থামিয়ে দিয়েছে কেউ। কোমায় চলে গিয়েছে প্রাধণবন্ত হলটা। বন্ধ কোলাপসেবল গেটের ওপারে আজও একইরকম রয়েছে House full এবং Noon, Mat, Eve, Night লেখাগুলি। শুধু সেগুলিতে আর প্রাণ নেই। কেয়ারটেকার মাত্র রয়েছন এই ভগ্নস্তুপের পাহারাদার হয়ে। তিনি বিশেষ কিছু বলতে না পারলেও বা বলতে না চাইলেও স্থানীয় এক দোকানদার স্পষ্টতই বললেন, ‘প্রোমোটারকে বেচে দিয়েছে’ ।

কথার সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে হলের গেটের ভেতরে রাখা খান কুড়ি নেমপ্লেটে সাজানো কাঠের বোর্ড। নাম দেখে অনায়াসে ধরে নেওয়া যায় --ওগুলো রিয়েল এস্টেট কোম্পানির নাম।

'পূর্ণ' সিনেমার পাশেই আজও সচলভাবেই টিঁকে রয়েছে 'বিজলি' সিনেমা। চালু রয়েছে, তবে টিকিটের দাম এবং খাঁখাঁ ফুটপাত বলে দিচ্ছে এই হলটি টিঁকে রয়েছে একেবারেই নিজস্ব প্রাণশক্তির জোরে। এছাড়া আর কিছুই নয়। ১০০ টাকায় ব্যালকনি! অবিশ্বাস্য লাগে বৈকি। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে টিকিটের দাম নিয়ে লোকাল দর্শকের দরাদরি। এগুলোর দ্বারাই বোঝা যায় টিঁকে থাকার এক মহৎ সংগ্রামে অংশ নিয়েছে একদা স্বনামখ্যাত তিনমূর্তির এক মূর্তি 'বিজলি' সিনেমা। একইরকমভাবে টিঁকে রয়েছে হাজরা মোড়ের 'বসুশ্রী'। লোকাল ছেলেপিলেদের টাইমপাস এবং সস্তায় হলিউড ছবির হিন্দি ভার্সন দেখতে আসার কারণে 'বসুশ্রী' আজও বারবণিতার মতো ঘুমচোখে দরজা খুলে দেয়।

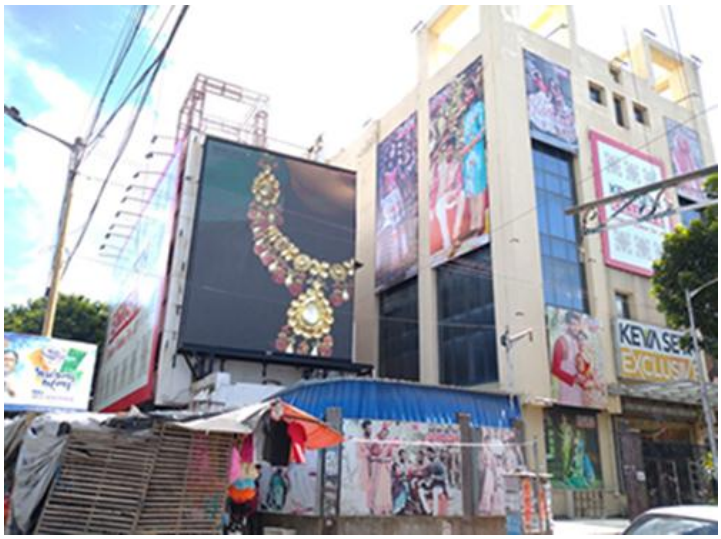

এরপরেই পা টেনে নিয়ে যায় 'উজ্জ্বলা' সিনেমার দিকে। 'উজ্জ্বলা' নেই, তবে 'উজ্জ্বলা'-র নাম আছে। নামটাকে ধারণ করে বাঁচিয়ে রেখেছে সেই বিখ্যাত চানাচুরওয়ালা। সিনেমা হলটি এখন 'কেয়া শেঠ শপিংমল'। দক্ষিণ কলকাতার এই বিখ্যাত চানাচুরের দোকানের 'উজ্জ্বলা' নামটা কিন্তু সাধারণ মানুষেরই দেওয়া। সিনেমা হলটি বন্ধ, অথচ

এই নামটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁরাই। প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়ার উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়লেন দোকানি। ‘হল বন্ধ হবে না কেন? আপনি এবছরে কটা সিনেমা দেখেছেন হলে গিয়ে, বলতে পারেন?’ বলতে পারিনি। চুপ করে সরে আসতে হল।

জন্মের পর চোখ খুলেই যে সিনেমা হলটিকে আমি প্রথম চিনেছিলাম তার নাম 'আলেয়া'। রবিবারের ছুটির দুপুরে 'আলেয়া'-য় গিয়ে নতুন কোনো বাংলা ছবি দেখতে পাওয়াটা ছোটোবেলায় আমার কাছে ছিল বিশাল এক বিনোদন। গড়িয়াহাট ও ফার্নরোডের সংযোগস্থলে সেই তোরণ আর নেই! বন্ধ হয়েছে বেশ কয়েকবছর। সামনে দাঁড়ালেই বুকের কাছটা ফাঁকা লাগল কিনা সে প্রশ্ন বড়ো হয়ে দেখা দিল আজ , যখন সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম বাঁশের ভারা বেঁধে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে। মিস্তিরিদের ঠিকাদার জানালেন ‘বাড়ি, কমার্শিয়াল দুইই হবে’ । নতুন তৈরি গেটের ওপর ছোট্ট সোনালি ফলকে 'আলেয়া' লেখাটা রয়েছে। তবে সেটা থাকবে কিনা জানা নেই। টালিগঞ্জের 'ভবানী' সিনেমা হলও বিক্রি হয়ে গিয়েছে। চলে গিয়েছে প্রোমোটারদের হাতে। এখন কতদিনে সেই হলটা মল-এ রূপান্তরিত হয়, এখন সেটারই অপেক্ষা। মল হয়েছে ধর্মতলার 'গ্লোব' সিনেমাও। গভর্নর লর্ড লিটনের হাতে ১৯২২ সালে যে 'গ্লোব' সিনেমার উন্মোচন, সেটি আজ 'গ্লোব শপিং সেন্টারে' পরিবর্তিত। শ্রদ্ধেয় চন্ডী মুখোপাধ্যায় তাঁর উক্ত প্রবন্ধে যে সিনেমা হলটি একমাত্র স্মৃতি রূপে টিঁকে থাকার কথা উল্লেখ করেছিলেন, দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে আজ সেই 'এলিট' সিনেমাও বন্ধ

হয়ে গিয়েছে। বন্ধ প্রেক্ষাগৃহে বসে রয়েছেন পাহারাদার। তিনি কি জানেন বাংলা সিনেমার একটা যুগের কবরস্থানকে পাহারা দিচ্ছেন তিনি?

সিনেমা হলগুলির বিলুপ্ত হবার সঙ্গেসঙ্গে এভাবেই বিস্মৃতির খোঁড়া কবরে হারাতে বসেছে কলকাতার চলচ্চিত্রের স্বর্ণালি ইতিহাস। কিছু সিনেমা হল আজও হয়তো রমরমিয়ে ব্যবসা করছে, তবে সংখ্যায় সেগুলি নেহাতই হাতে গোনা। তবে সব শেষে আরেকটি খবর দিয়ে আমরা আপাতত আলোচনায় ইতি টানব। সেই খবরটি আশা কিংবা বা নিরাশার সেটা ঠিক জানা নেই। বন্ধ হওয়া সিনেমা হলগুলির মধ্যে শিয়ালদার 'প্রাচী' সিনেমা নবজীবন লাভ করেছে। 'প্রাচী' র বিল্ডিংয়ে মার্কেট কমপ্লেক্স 'এম বাজার', তবে সেই মার্কেটের গর্ভেই নতুন করে জন্ম নিয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর 'প্রাচী' সিনেমা। চন্দ্রিল ভট্টাচার্য এক আলোচনায় একবার সিনেমা হলের ভবিষ্যত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'সিনেমা হলগুলি চলে যাবে Spectacle-এর দিকে।' প্রাচী-তে ইতিমধ্যেই তার সূচনাও হয়ে গিয়েছে। সাধারণ 2D সিনেমার পাশাপাশি নবনির্মিত প্রেক্ষাগৃহে

ব্যালকনিতে ২০০/- এবং ফ্রন্টস্টলে ১৫০/- টাকার বিনিময়ে 3D ছবির প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। চোখে বিশেষ চশমা লাগিয়ে সিনেমার 'থ্রি ডাইমেনশন' ফিলিং সমেত এক ভিন্নতর বিনোদনের জগতে পা বাড়িয়ে দিয়েছে 'প্রাচী' সিনেমা। টিঁকে থাকার এই

লড়াইতে অন্যরাও সামিল হলে প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহে বাড়বে। তবে শতাব্দীর ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলির মতোই ভেন্টিলেশনে চলে যাওয়া সিনেমা হলগুলিকে অক্সিজেন দিয়ে না বাঁচালে 'আত্মবিস্মৃত' জাতি হিসেবে বাঙালির বদনামটা আরেকটু বাড়বে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

স্মৃতির সেদিন : বাংলা সিনেমা

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

একটা সময় অবধি মঙ্কুদি ছিলেন সিনেমা-পাগল। একটা সময় কেন , জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সিনেমার পরিবেশের মধ্যেই তো দিন কাটিয়েছেন তিনি। তিনি সত্যজিৎ রায়ের স্ত্রী , সন্দীপ রায়ের মা। এছাড়াও আসল সূত্রটা হল সত্যজিৎ তথা মানিককে বিয়ে করার আগেই তিনি বাংলা ছবির নায়িকা। শুধু বাংলা কেন, বোম্বাই-তে গিয়ে হিন্দি ছবিতেও নায়িকা হন বিজয়া তথা মঙ্কু। চলচ্চিত্র কেরিয়ারের শুরুতেই তাঁর মানিকের সঙ্গে প্রেম এবং বিবাহ। যুবক সত্যজিৎ তখন সিনেমা-পাগল। চোখে চলচ্চিত্রকার হবার স্বপ্ন। ছোটো বয়স থেকেই বিদেশি ছবি নিয়মিত দেখছেন বিজয়াও। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রচুর হলিউডের ছবি আসত কলকাতায়। মানিকের সঙ্গে এইসব ছবি নিয়ম করে দেখতেন তিনি। আশির দশকে নন্দন তৈরি হবার পরেও এখানে এসে ভালো ভালো সব ছবি দেখতেন। সেও প্রায় নিয়মিতই।তখনও তাঁর আত্মজীবনী 'আমার কথা' বেরোয়নি। তবে সাংবাদিকতা সূত্রে এসব বিষয় জানা হয়ে গেছে। আশির দশকেই তো বেরোল 'আজকাল' নামের এক সংবাদপত্র। নতুন ভাবনার কাগজ। যেখানে জড়িয়ে গেল প্রতিভাবান এক ঝাঁক তুর্কী তরুণ। সেইসময় এই কাগজের সংস্কৃতি বিভাগের সঙ্গে সাংবাদিক হিসেবে জড়িয়ে গেলুম আমিও। প্রথমে নিউজের সঙ্গে আমাদের বসার জায়গা হলেও পরে সংস্কৃতি বিভাগের আলাদা ঘর হল

প্রেস লাগোয়া। আমাদের আগেরটাই খেলার। সেখানেই তো প্রথম দেখি সুনীল গাভাসকারকে। আজকাল প্রকাশনার 'ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার' বলে একটা মাসিক ইংরেজি কাগজ তখন সম্পদনা করতেন তিনি। নিয়মিত না এলেও কোনো সূত্রে কলকাতায় এলে ই আজকাল অফিসে আসতেন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে প্রথম সামনাসামনি কথা বলার সুযোগ। সংস্কৃতি বিভাগে আমার বসার জায়গাটা ছিল দরজা ঠেলে ঢুকেই বাঁদিকে। আমার পাশে বসতেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। তিনি 'আজকাল' –এর চিঠিপত্র বিভাগটা দেখতেন। আমাদের বিভাগের প্রুফরিডার ছিলেন একরাম আলি, তিনি সন্দীপনকে চিঠিপত্র দেখতে সাহায্য করতেন। সন্দীপন তখন চাকরি করতেন কলকাতা করপোরেশনে। অফিস থেকে সোজা আসতেন 'আজকাল' অফিসে। অনেক চিঠি নিজেই তৈরি করতেন। সেগুলো এখনও নিঃসন্দেহে অ্যাসেট। কোনো কোনো দিন কাজকর্মের ফাঁকে সন্দীপনদা উঠে দাঁড়িয়ে আওয়াজ দিতেন 'চলো' । ও এই ডাক আমাদের চেনা ডাক। আমি, আপ্পা, তাপস ও আরও কেউ কেউ সন্দীপনদাকে অনুসরণ করতাম। 'আজকাল' তখন রাজা রামমোহন সরণিতে। রাস্তা ধরে হেঁটে সন্দীপনদার নেতৃত্বে আমরা পৌছোতাম লোহাপট্টির পাশের গলি দিয়ে ঢুকে একটা দোতলা বাড়ির একতলায়। ঘরে সারি সারি চাটাই পাতা। সেখানে বাবু হয়ে বসে মদ্যপান হচ্ছে। দুই ভাইয়ের বেয়াইনি ঠেক। ঢোকার সঙ্গেসঙ্গে বিয়েবাড়ির মতন আমন্ত্রণ দুই ভাইয়ের। চাটাই–এ বসার সঙ্গেসঙ্গে গেলাস আর পেঁয়াজ মেশানো ভাজা ছোলার চাট হাজির। স্কচ থেকে দেশি বাংলা সব পাওয়া যেত ওখানে। মুখ থেকে খালি বলার অপেক্ষা। বোতল থেকে সরাসরি পেগ মেপে গেলাসে মদ ঢেলে দিত খোদ মালিক। গেলাস খালি হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে দুইভাই–এর যেকোনো একজন বলতেন, আরেকবার দিই স্যর। যেন বিয়েবাড়িতে পংক্তি ভোজনে বসেছি। যাই হোক সন্দীপন স্টাইলেই বলি, তো এই হল সেই সময়। যখন বিজয়া রায় চলচ্চিত্র উৎসবে বেছেবেছে ছবি দেখতেন। শুধু দেখতেন না, তা নিয়ে কথাবার্তাও বলতেন। পরিচালক অসিত সেনের সঙ্গে এইরকম এক আলোচনায় সাক্ষী থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সাম্প্রতিক বিশ্ব চলচ্চিত্র সম্পর্কে কী বিশাল জ্ঞান বিজয়া রায়ের সেদিন উপলব্ধি করেছিলাম। পরে তাঁর আত্মকথা থেকে তাঁর সিনেমা ভাবনা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারি আমরা। সত্যজিতের সিনেমা নির্মাণে বিজয়া রায়ের অবদান এখন তো আমরা প্রায় সকলেই জেনে গেছি। এবং অসিত সেন। তাঁর সঙ্গেও আলাপ আমার সেই 'আজকাল' –এর সাংবাদিকতা সূত্রেই। তখন তো তিনি ছবি করা বন্ধ করে দিয়েছেন। সেই সময় জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি থাকতেন নাকতলার কাছে এক ফ্ল্যাটে। নিজের নয় ওটা ওঁর দিদির ফ্ল্যাট। দিদির কাছেই থাকতেন তিনি। একদা বাংলা হিন্দি–তে সুপারডুপার সব ছবি করেছেন, তিনি অর্থনৈতিকভাবে নিজের

জীবনটাকে তেমনভাবে গুছিয়ে নিতে পারেননি। অবিশ্যি সেইসময় কেইবা পেরেছিল ! অথচ উত্তম বাদ দিয়ে সুচিত্রাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন আর কে , সেই তিনিই তো। একটা সময় উত্তম-সুচিত্রা এই জুটি থেকে বেরিয়ে নিজের নিজের অভিনয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিলেন। কেন জানিনা সুচিত্রার মনে হচ্ছিল উত্তমের আড়ালে তাঁর অভিনয় ক্ষমতা মার খেয়ে যাচ্ছে। এই সময় তাঁর র অসিত সেনের সঙ্গে আলাপ, যে আলাপ অসিত সেনের মৃত্যু পর্যন্ত একই ভাবে বজায় ছিল। সুচিত্রা স্বনির্বাসনে যাবার পর যে

কজন মানুষের তাঁর বাড়িতে অবাধে অধিকার ছিল তার মধ্যে অন্যতম একজন অবশ্যই অসিত সেন। এসব কথা শুনেছি খোদ অসিত সেনের কাছেই। এসময় সাংবাদিকতার বেড়া ডিঙিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আমার অসিতদা। শুধু কাজে নয় একান্ত আড্ডা মারার জন্যে কত গেছি তাঁর বাড়িতে। শুধু বাংলা বা বোম্বাইয়ের সোনালি সময়ের ইতিহাস নয়, সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্র সম্পর্কে অবিরত কথা বলে যেতে পারতেন। ওর কাছ থেকেই তো জেনেছি 'দীপ জ্বেলে যাই' বা 'উত্তরফাল্গুনি' ছবিতে সুচিত্রা-নির্মাণের না জানা কত গল্প। সম্পর্কটা অসিতদার সঙ্গে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌছেছিল যে তাঁর বাড়িতে দিদি এসে দরজা খোলার পর আমার গলা শোনার সঙ্গেসঙ্গে ওদিক থেকে অসিতদার আওয়াজ, পাসপোর্ট কোথায়? পকেট থেকে 'রাম' -এর বোতলটা বার করে দেখাতাম। হোহো করে হেসে উঠতেন তিনি।বলতেন, দামটা নিয়ে যেতে ভুলবি না। 'রাম' ছিল আমার অসিত-রাষ্ট্রে ঢোকার পাসপোর্ট। প্রায় ভারতে সবাক ছবি আসার সময় থেকে সিনেমার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন তিনি। সবাক বলিউড এবং টলিউডের আদিঅন্ত জানেন। আড্ডা মারতে মারতে সেইসব অভিজ্ঞতা উপুড় করে দিতেন। কাটত এক অনন্য সময়। সুচিত্রাকে নিয়ে কত অজানা গল্প, যা একমাত্র তাঁর ঝুলিতেই রয়েছে। এই মানুষটি চলচ্চিত্রউৎসবের নিয়মিত দর্শক। আগে থেকেই বাছাই করে নিতেন কী কী ছবি কোথায় কোথায় দেখবেন। শেষ অবধি তিনি ছবি না করলেও সারাক্ষণ জড়িয়ে থেকেছেন চলচ্চিত্র-ভাবনার সঙ্গে।

লেখা ১৪

১০০ বছরের ঐতিহ্যে আজও অম্লান 'মিত্র কাফে'

কিঞ্জল রায়চৌধুরী

শহুরে বাঙালি আজ যতই চাইনিজ, তন্দুর, পিৎজা বার্গারে অভ্যস্ত হোন না কেন, একদম আদি অকৃত্রিম বাঙালি জিভ হলে তার মধ্যেই চপ-কাটলেট খুঁজবেন না এমন ভোজন রসিক দুর্লভ। আর চপ-কাটলেট-কবিরাজির নির্মাণশালা 'মিত্র কাফে' আজও এব্যাপারে অতুলনীয়। শোভাবাজার মেট্রোর উল্টোদিকে হলুদ অক্ষরে আজও ঝলমল করছে সেই নাম। সগৌরবে ১০০ বছর পার করেও এখানকার 'চিকেন আফগানি' বা 'ব্রেন চপ' আজও চাহিদা অনুযায়ী বাঙালি রসনা তৃপ্ত করে চলেছে।

সময় বদলেছে। দমদম থেকে নিউটাউন, গড়িয়াহাট থেকে বিরাটি, এমনকি শিলিগুড়ি ও নিউ দীঘাতেও ছড়িয়ে পড়েছে অসংখ্য আউটলেট। হ্যাঁ , 'মিত্র কাফে'-র আউটলেট সার্চ করলে আজ আপনি অনেকগুলি লোকেশন পাবেন ঠিকই, তবে কিনা মেন শপ যদি বলেন, এখনও কিন্তু এই যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেনিউকেই নির্দেশ করবে; কারণ এটাই হল গিয়ে যাকে বলে আদি 'মিত্র কাফে'। কিন্তু প্রশ্ন হল স্বনামখ্যাত 'মিত্র কাফে'-র এতগুলি আউটলেট ছড়িয়ে পড়লেও, খাবারের কোয়ালিটি সর্বত্রই কি একইরকম বজায়

রাখতে পেরেছেন তাঁরা? আমরা সেই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব অবশ্যই। কিন্তু সেপ্রসঙ্গে আসার আগে 'মিত্র কাফে'-র অতীত ইতিহাসটা স্বল্পকথায় ঝালিয়ে নেওয়া যাক আসুন। 'মিত্র কাফে' রেস্তোরাঁটি মিত্রদের হলেও, মালিকানা কিন্তু রায়দের। এর নেপথ্য কাহিনি পদ্যের অক্ষরে সাজিয়ে রেখেছে বর্তমানে মিত্র কাফের হাতে আঁকা দেয়াল। "পেট ভরে খাওয়া আর প্রাণভরে আড্ডা/১৯১০ সালে শোভাবাজারে শুরু যাত্রা/বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতেন ঁসুশীল রায়/ ভালোভাবে বুঝতেন মানুষ কী চায়...'।মিত্র কাফের প্রতিষ্ঠাতা গণেশ মিত্র ১৯২০ সালে তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু সুশীল রায়ের হাতেই ব্যবসার দায়িত্ব তুলে দেন। সুশীলবাবুই 'মিত্র কাফে' চালাতেন। রায় মশাইয়ের মৃত্যুর পর দায়িত্ব নেন তাঁর স্ত্রী গীতা রায়। মূলত এঁদেরই হাতযশে ছড়িয়ে পড়ে 'মিত্র কাফে' র সুখ্যাতি।

থিয়েটার পাড়ার নিকটবর্তী হওয়ায় আড্ডা জমিয়ে চাঁদের হাট বসত একসময়। উত্তম কুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কে না এসেছেন এখানে? আজ হয়তো সেই স্বর্ণালি অধ্যায় অতীত। তবে সেই ঐতিহ্য আজও বহন করছে এই মিত্র কাফে। দুপুরে পরোটা-কষা মাংস অথবা সন্ধ্যায় চপ-কাটলেটের চাহিদা আজও সমানতালে রয়েছে।

আজকের 'মিত্র কাফে'-র অঙ্গসজ্জায় হাতে পেইন্ট করা দেয়ালে সেই সুখ্যাতির কিছু নিদর্শন রাখা হয়েছে। এছাড়া বাড়তি দেখনদারি এতটুকুও নেই। সেই কাঠের চেয়ার, সাদা পাথর বসানো কাঠের টেবিল -- রয়ে গিয়েছে একই রকম।কিন্তু খাবারের সেই পুরোনো স্বাদ! সেটাও কি একইরকমভাবে বজায় রাখতে পেরেছে 'মিত্র কাফে?'

মিত্র কাফের দেয়ালের অঙ্গসজ্জা

উত্তর খুঁজতে আমরা সরাসরি কাস্টমারকেই প্রশ্ন করেছিলাম। অফিস আওয়ারের ব্রেকে পরোটা ও কষা মাংস দিয়ে লাঞ্চ সারছিলেন যুবক সুমন দে। পরণে ফর্মাল পোশাক। আধুনিক কেতাদুরস্ত। উত্তর কলকাতার ছেলে। গিরীশ পার্কে বাড়ি। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। সুমন দে জানালেন, 'বাবা একসময় নিয়মিত আসত। আমি ১৯৯৮ সাল থেকে এখানে খেতে আসছি। ছোটোবেলায় বাবার হাত ধরে, তারপর একা' ।

ইদানিং শোনা যাচ্ছে, মিত্র কাফের বিখ্যাত ডিশ্ 'ব্রেন চপ' বা 'পুডিং' নাকি পাওয়া যায় না? প্রশ্নের উত্তরে সুমন দে সাফ জানান, ‘ভুল কথা। এই তো একটু আগেই আমি ব্রেন চপ অর্ডার করে খেয়েছি।’

রসনাতৃপ্তির ঝলকে চকমক করছিল যুবকের মুখ। তিনি নিজের উৎসাহেই বলে চলেন, ‘কলকাতায় আর কোথাও এমনকি কলকাতার বাইরেও এই ব্রেন চপ পাওয়া যায় না। মুম্বইয়ের 'অলিম্পিয়া' রেস্টুরেন্টে পাওয়া যায় ব্রেন কারি, বাট দ্যাট ইজ নট চপ। একমাত্র এই মিত্র ক্যাফেতেই বিশেষ এই পদটি পাওয়া যায়। অ্যান্ড ইট ইজ এক্সেলেন্ট!" সুমন দে জানান, পুডিংও পাওয়া যায়। তবে সেটা চাহিদার ওপর কিছুটা নির্ভর করে। আর খাবারের কোয়ালিটি? আগেকার সঙ্গে কোনো তফাৎ ঘটেছে কি ? সুমন দে স্পষ্টতই জানান, মিত্র কাফের অন্য আউটলেটগুলিতে তিনি খাবার খেয়েছেন, সেসব জায়গায় তেমন উন্নত মান ধরে রাখতে পারেনি। তবে এই আদি 'মিত্র কাফে' আজও তাদের কোয়ালিটির মান অনেকটাই ধরে রাখতে পেরেছে।

৮০/- টাকার ব্রেনচপ ! খেলে আর নিজেকে ইডিয়ট মনে হবে না

কী এই ব্রেন চপ? পাঁঠার ঘিলু দিয়ে তৈরি জিভে জল আনা একটি পদ। পাঁঠার ব্রেন টুকরো করে কেটে সেদ্ধ করে রাখা হয়। এরপর দুটো পেঁয়াজ, ও তিন কি চার কোয়া রসুন ও আদা কুচিয়ে তাতে পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো ও নুন দিয়ে ভালো করে মিশ্রণ তৈরি করে নিতে হবে। সেদ্ধ করা পাঁঠার ব্রেনের টুকরোগুলো মিশ্রণে মাখিয়ে গোল্লা করে চপের আকার দেওয়া হয়। নরম গোল্লাগুলোর কোটিং তৈরি করতে পাঁউরুটির গুঁড়ো ব্যবহার করাই রেওয়াজ। ডিমের গোলায় ডুবিয়ে পাঁউরুটির গুঁড়ো মাখিয়ে ডোবা তেলে ভেজে নিলেই সুস্বাদু ব্রেন চপ তৈরি। কাসুন্দি আর স্যালাড দিয়ে জমে যাবে।

'ব্রেন চপের' এই রেসিপি ফলো করে সাধারণভাবে সকলে বানানোর চেষ্টা করতেই পারেন। তবে তার স্বাদ 'মিত্র কাফে'-র সমতুল্য হবে কিনা এটা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। যদি ম্যানেজ করতে না পারেন , তাহলে সন্ধ্যাবেলায় 'মিত্র কাফের' টেবিলে হানা দেওয়া ছাড়া কিন্তু গতি নেই। স্বাভাবিক, সব ফর্মূলারই কিছু তো সিক্রেট থাকেই !

লেখা ১৫

নীতিগত ব্যর্থতাই বেকার সমস্যাকে তীব্র করে তুলছে

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

বেকারত্বের সমস্যাটা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। শুধু তীব্রতর হচ্ছে তা নয় এই সমস্যার মোকাবিলা করতে গিয়ে সরকার নিজেই নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে। গত ৪৫ বছরে এত বেকারত্ব এ দেশে কোনো দিন দেখা যায়নি। এখন দেশের গড় বেকারত্ব রয়েছে প্রায় সাড়ে সাত শতাংশের কাছাকাছি। কিছু মাস আগে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পরিসংখ্যান মন্ত্রকের কাছে প্রতি মাসে বেকারত্ব এবং কর্মসংস্থান নিয়ে সমীক্ষা লব্ধ তথ্য জানতে চেয়েছেন যাতে আগামী ২০২৪ এর নির্বাচনের আগেই এই কঠিন সমস্যাকে কিছুটা হলেও বাগে আনতে পারেন। কদিন আগে নতুন শিক্ষানীতিকে কী করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে কাজে লাগানো যায় তাই নিয়ে সঠিক নীতি নিতে খোদ প্রধানমন্ত্রী অনুরোধ করেন। এসব খবর একদিকে আশা জাগায়, কারণ সরকার বুঝতে পেরেছে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। তাই এখন তারা গোড়াতে গিয়ে সমীক্ষার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে আরেকটি প্রশ্ন তোলে। কী করে তাহলে সরকার বাহাদুর বলেন ১০ লক্ষ কর্মসংস্থান তাঁরা বছরে করবেন ? এসব কি স্রেফ কথার কথা ? মানে, যেমন সেই ভোটের আগে দেওয়া হয়েছিল প্রত্যেক ভারতবাসীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষই যদ্দুর মনে পড়ছে টাকা ঢোকাবার প্রতিশ্রুতি !

কেন আমাদের দেশের বেকারত্বকে তারা সমাধান করতে পারছেন না ? বলা হয় দেশে জিডিপির হার বাড়লে কর্মসংস্থান বাড়বে। এই তো জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে

জিডিপির হার ছিল ৮.৬%। দেশে বেকারত্বের হার ছিল ৭.৫%। বৃদ্ধি সত্ত্বেও তাহলে কর্মসংস্থান বাড়ছে না কেন ? প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে গেলে গভীরে তলিয়ে গোটা পরিস্থিতি বোঝা প্রয়োজন।

মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের অর্থনীতি গতি হারিয়েছে। ভুল অ্যাসেসমেন্টে নোটবন্দি এবং ভুলভাবে জিএসটি প্রয়োগের পর বৃদ্ধির হার আসলে প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে। মোদি যখন ক্ষমতায় এসেছিলেন , ২০১৪ সালে, তখন বৃদ্ধির হার ঘোরাফেরা করছিল চার থেকে সাড়ে চার শতাংশে। করোনার আগে ছিল সাড়ে চার শতাংশ।এরপর বৃদ্ধি হলেও বেকারত্ব কমে যাবে বা কর্মসংস্থান বেশি হচ্ছে তা নয়। অবস্থা এমন হয়েছে যে আগামী ২০২৪ এর নির্বাচনে দেশের সামনে বেকারত্বের সমস্যাটাই একটা বড়ো কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু কেন? সেই জায়গাটায় আসি।

প্রথম কথা নীতিগত ব্যর্থতা। একটি অর্থনীতিতে কীভাবে বিনিয়োগ করলে কর্মসংস্থান বাড়বে তার কতগুলো নীতি আছে। সরকার এই দেশে নিয়োগকে মাথায় রেখে অর্থনীতি চালায় না। ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বাড়াতে উৎসাহমূলক ভাতা ও পরিকাঠামো তৈরি করে, কিন্তু কার্যত সেগুলো সবই বড়ো পুঁজিপতিদের স্বার্থে চলে যায় ঘুরপথে।

প্রথমদিকে মোদি ভেবেছিলেন , মেক ইন ইন্ডিয়া স্লোগানেই বিনিয়োগ হবে। কিন্তু সেটা ভীষণভাবে ব্যর্থ হয়েছে । সেখানেও নীতিগত ব্যর্থতা। অর্থনীতির মূল কাঠামোটা কিন্তু বড়ো কর্পোরেট দ্বারা নির্ধারিত নয়। কর্ম সংস্থানের একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প। এবং সমস্যা হল, এই জায়গাটাই ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে। মোট ৬ কোটি ৩৩ লক্ষ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মধ্যে ৯৫ শতাংশ হল অতি ক্ষুদ্র ইউনিট। তবু এটাকে বলা হয় ভারতবর্ষের সবথেকে বেশি নিয়োগের ক্ষেত্র। সরকার নিজেই ভাবুন তাহলে পরিস্থিতি কত খারাপ!

এরপর আসা যাক স্টার্ট আপ ইন্ডিয়ার কথা ! মোদির স্বপ্ন ছিল ডিজিটাল ইন্ডিয়ার । তাঁর সরকার ভেবেছিল স্টার্টআপ তৈরি করলে সেখানে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান ঘটবে। গত চার বছরে সেখানে নিয়োগের চিত্রটা যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে, স্টার্টআপ ইউনিটে কিন্তু মাত্র গড়ে বারো জনের বেশি চাকরি হয়নি।

যাই হোক, এই সরকারের মূলনীতি হল কর্পোরেট বান্ধব হয়ে ওঠা।

ব্যাংকের লক্ষ লক্ষ করে টাকা ঋণ দেওয়ার পর কর্পোরেট ফেরত দেয়নি। এভাবে কর্পোরেট উন্নয়ন হচ্ছে। বিজেপি সরকারের মূল লক্ষ্য : একদিকে আদানি থাকুক ,একদিকে আম্বানি থাকুক ! এরকম দু-একজন পেটোয়া পুঁজির মালিককে সামনে রেখেই অর্থনৈতিক কাঠামোয় নতুন ছাঁচ বানানো হবে। কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত এবং কর্পোরেট পরিচালিত স্বার্থে দেশকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়াই মূল উদ্দেশ্য। কৃষি ব্যবস্থা, থেকে শুরু করে ব্যাংকিং ব্যবস্থা, পরিকাঠামো ক্ষেত্র সহ যে আটটি মূল ক্ষেত্রের(যার ওপর অর্থনীতি দাঁড়িয়ে থাকে) প্রত্যেকটা জায়গায় সরকার নিজেই কর্মসংস্থান সংকুচিত করে চলেছে । সরকার নিজেই সাড়ে ছয় লক্ষ সরকারি চাকরির পদ তুলে দিয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র রেলে তুলে দিচ্ছে প্রায় ৪.৫ লক্ষ পদ।

তাহলে নতুন করে চাকরিটা হবে কোথায় ? নীতি এমনই করা হয়েছে যেন সরকারের গোটা ক্ষেত্রটাই বেসরকারি হাতে চলে যায়। সরকারি সংস্থাগুলির চাকরি চলে যাচ্ছে ঠিকাদারদের হাতে। সরকারও সরাসরি নিয়োগ করছে না। নিয়োগ হচ্ছে, কন্ট্রাকটারের হাত ধরে ঘুরপথে। চুক্তিভিত্তিক । সীমিত সময়ের জন্য। সরকার নিজেই চাইছে সরকারি সম্পত্তির মূল মালিকানা বেসরকারি হাতে চলে যাক । শুধু বেসরকারি হাতে নয় , বিদেশি সংস্থা এসে গ্রহণ করে নিক দেশের সরকারের সংস্থা। তাই বিদেশি লগ্নির যে সর্বোচ্চ সীমা ছিল সেটাও বহু ক্ষেত্রে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তার সঙ্গে শ্রম আইনের সংস্কার এমনভাবে করা হচ্ছে যাতে বিদেশি সংস্থাগুলি তাদের দাবি অনুযায়ী ব্যবসা করতে পারে। শ্রমিকের মূল্যায়ন ভূলুণ্ঠিত।

আর্থিক বৃদ্ধির হারের সঙ্গে বলা হচ্ছে কর্মসংস্থান বাড়বে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে না । বৃদ্ধির সুফলটা পাচ্ছেন শিল্পপতি ও পুঁজিবাদীরা, যাঁরা পুঁজি খাটিয়ে মুনাফা নিচ্ছেন। ফলে, বৃদ্ধির হার কেঁদে ককিয়ে যতটা বাড়ছে তাতে একটা শ্রেণির বৃদ্ধি হচ্ছে। আর্থিক অসাম্য বাড়ছে। কিন্তু যদি কর্মসংস্থান হত তাহলে সকল শ্রের উন্নতি হত ! ফলে কর্মসংস্থান না হওয়ার জন্য দারিদ্র মুক্তি যেমন

ঘটছে না , সেই হারে এই দেশে অসাম্যও কমছে না । এই দুটো না কমার ফলে ভারতীয় অর্থনীতির প্রকৃত বেস লেভেল শক্ত হচ্ছে না । এটা হলে চক্রাকারে কর্মসংস্থান এবং মানুষের আয় ও সঞ্চয় দুটোই বাড়ত।

কর্মসংস্থানের সমস্যা দূর করতে হলে অর্থনীতির অভিমুখ বদল করতে হবে। কর্পোরেটমুখী উন্নয়ন না করে কৃষিভিত্তিক, কৃষিপণ্যভিত্তিক, কৃষি উদ্বৃত্ত থেকে ক্ষুদ্র, মাঝারি, শিল্প ভিত্তিক, এবং রপ্তানি বাড়িয়ে , রপ্তানি পণ্যের চাহিদা বাড়িয়ে নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলো তৈরি করতে হবে। বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে একমাত্র বিপিও এবং আই টি ই এস ও তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে ৫ লক্ষ নিয়োগ আসছে। করোনার পর একমাত্র এইসব ক্ষেত্রেই চাকরির বড়ো সুযোগ আসছে। অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট এবং রিটেইল সংস্থাগুলি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। খুব সীমিত হলেও বেশ কিছু জায়গায় নানা ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। সরকারের উপর ভরসা না করে এই সমস্ত ক্ষেত্রের জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে হবে। নইলে আগামী দিনে যুবসমাজের চাকরি পাওয়াটা সত্যিই খুব কষ্টকর কল্পনা হয়ে দাঁড়াবে।

যোগাযোগ

ইমেইল

write@banglastreet.online

ফোন (ভারত)

+91 33 4062 1285

ফোন (বাংলাদেশ)

01924935620

ঠিকানা (ভারত)

CE 17, 3rd Cross Road,
Sector 1, Salt Lake, Kolkata,
West Bengal 700064

ঠিকানা (বাংলাদেশ)

House No.27B, 1st Floor,
Road-3 Dhanmondi,
Dhaka 1205

বাংলা স্ট্রিট অনলাইন

আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন